উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

জুলাই ২০২০। মূল্য ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

বিশেষ
নিউ নর্মাল
সংকলন

ডুয়ার্সের পর্যটন বাঁচিয়ে তুলতে সঞ্জীবনী রুট কী?

ধারাবাহিক উপন্যাস। দুই সংখ্যার এপিসোড একত্রে

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট। তাজ্জব মহাভারত।

নতুন নিয়মিত কলম।

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা? আমচরিত কথা

শ্রীমতি ডুয়ার্স। নতুন সংযোজন

বিজ্ঞান সাধনায় নারী। পাতাবাহার।

ডুয়ার্সের বর্ষামঙ্গল

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

এখন ডুয়ার্স

সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ গৌতমেন্দু রায়

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের চিঠি ৩
ডুয়ার্সের বর্ষামঙ্গল ৪

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৭

পর্যটন
উত্তরের পর্যটনে ঘুরে দাঁড়ানোর রুট চাই! ১৪

গান্ধী ১৫০। খোলা মনে
সুভাষের কংগ্রেসত্যাগের পেছনে
গান্ধীর চক্রান্ত কতটা সত্যি? ১৮

রাজনগরের রাজনীতি
ওপারে জন্ম নিল স্বাধীন বাংলা ২১

আসামের চিঠি
আসামের অর্ধেক মানুষ চরম আর্থিক সংকটের মুখে ২৫

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ২৮

এ নদী কেমন নদী
ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি নদী বাঁচাতে হবে ৪২

এ ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?
'উত্তরাধিকার' সন্ধানে আজকের গয়েরকাটায় ৪৬

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৫২

গল্প
নদীর ধারে বাড়ি ৭০
শোভাদিদিমুনি ৭৯

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৮৪
খুচরো ডুয়ার্স ৮৬

শ্রীমতি ডুয়ার্স
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারী ৮৯
পাতাবাহার ৯৩
কর্ণপত্রী উরুভি ৯৪

এ কি প্রকৃতির প্রতিশোধ? নাকি প্রতিষেধক?

দীর্ঘ ঘরবন্দী দশা পার হয়ে পদাতিক এক্সপ্রেস ফের চালু হওয়ার পর কলকাতা থেকে সবচেয়ে দূরের জেলা কোচবিহারে ট্রেনে পৌঁছতে সময় লাগছিল চোদ্দ ঘন্টা। আর ভিনদেশি অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইতে কলকাতা থেকে কোচবিহার টেস্টিং যন্ত্র এসে পৌঁছে ল্যাব চালু হতে সময় লাগল চোদ্দ সপ্তাহের বেশি! ভিনরাজ্য থেকে কাতারে কাতারে ঘরে ফেরা ত্রস্ত শ্রমিকের ঝড় সামলাতে হিমশিম অবস্থা হয়েছিল ডুয়ার্সের ঢাল তরোয়ালহীন প্রশাসনের, ট্রুন্যাটের যন্ত্র দেখিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দিন কেটেছে স্বাস্থ্যকর্তাদের, দিকপাল নেতারা কোয়ারেন্টাইনের আশপাশে আসবার মুরোদ দেখান নি। তবু ডুয়ার্সের মাটিতে চা বাগানে কিংবা প্রত্যন্ত গাঁয়ে আক্রান্ত শ্রমিকের অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল বা মৃত্যুর খবর এযাবৎ নেই। কারণ এখানে শহরের সবজান্তা জনগণ সাবধানী, গ্রামীণ কমজান্তা মানুষ আরও বেশি সাবধানী। শহুরেরা অলস পরিশ্রম বিমুখ, স্কুটিতে ভুঁড়ি ভাসিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বাজারে আপিসে আদালতে যান। গ্রামীণ মানুষ অলস তবু পরিশ্রমী, নিদেনপক্ষে একবেলা জমিতে নিড়ানি দেন। কিন্তু উত্তরের শহর থেকে গ্রাম, অলস বা পরিশ্রমী সবাই একথাটি জানত, চাইলেই টেস্ট করার উপায় নেই, ঘরে ঘড়া ঘড়া মোহর থাকলেও উপায় নেই। সন্দেহ হলে তবেই টেস্ট, কিন্তু রেজাল্টের জন্য শুয়ে থাকতে হবে সাত থেকে দশদিন। হয়ত সেইজন্যই কথায় বলে, যার অন্য কোনও ভরসা নেই তার 'ওপরবালা' আছেন। অন্তত বাবা জল্পেশ আর মদনমোহনের নদীঅরণ্যময় সবুজের দেশে তো বটেই।

ওপরওয়ালার ফুসফুস ক্রমশ অকেজো হয়ে আসছিল দিনকে দিন, ধমনীতে বইছিল বিষ। আমরা হিংস্র বেপরোয়া হয়ে উঠছিলাম, ছাত্র থেকে শিক্ষক, কামুক থেকে ধর্ষক, সুদখোর থেকে ঘুষখোর, মালিক থেকে নেতা-- সবার শ্বাদন্ত পরিস্ফুট হচ্ছিল ক্রমশই, চাই আরও চাই, আরও আরও চাই। তার বাসনা-স্পৃহার রাসায়নিক তাপ সবুজহীন পৃথিবীকে গরম করে তুলছিল ক্রমশ। চেতনা বা প্রেম বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছিল কবে জানা নেই। আমরা কেউ কেউ বিরিয়ানি চিল্লিচিকেনে পেট ভরিয়ে বসে মিথ্যে প্রেমের কবিতা লিখছিলাম যদিও, প্রেমের ছবি আঁকছিলাম তবু। সে ছবিতে ব্যথা ছিল শুধু, সে কবিতায় সতেজ রঙের অভাব ছিল। সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে আজ মেঘে মেঘে ভয়াবহ বজ্রনিনাদ, বহুদিন বাদে আষাঢ়ের রাতভর অঝোরে বৃষ্টি ভাসিয়ে নিতে এসেছে আমাদের সেই ভাবনা বিশ্বাস সবকিছু। কতশত প্রতিষ্ঠানের কাছা ধরে টান মেরেছে, রাজপথে মুখ থুবড়ে থুবড়ে পড়ছে মহীরুহরা। কিংবা বিলীন হয়ে যাচ্ছে মহাকালের পাতায়। এতকাল চট পেতে পসরা সাজিয়ে বসেছিল যে সমাজ-বাজার-অর্থনীতি, তার চাটাই ধরে টান মেরে উলটে ফেলে দেওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকব আমরা, বাবার কৃপায় যদি এযাত্রায় বেঁচে যাই।

করোনা আমাদের মারে কম, দৌড় করায় বেশি।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের বর্ষামঙ্গল

দেবায়ন চৌধুরী

আমাদের ছোট্ট উঠোন। বৃষ্টি হলে এক পা অন্তর ইট ফেলা হয়। সেই ইটে পা দিলে নেপাল চপ্পলের কাদা ছিটকে এসে লাগে মাথার পেছনে। কালোচুলে বালুমাটি চিকচিক। উঠোনে আছাড় খেলে রোদ ওঠে এই বিশ্বাসেই কখনও মেঘের মুখ রোদ। দরজার ওপরে, খাটের রেলিং-এ রাখা, এদিক সেদিকের দড়ি থেকে মা জামা-কাপড়-বিছানার চাদর তুলে নেয়। তাদের গন্ধ নিলে বোঝা যায় কত উষ্ণতা আরও দরকার। সামনের টিনের চালের ওপর দিয়ে সুয্যি ওঠে লাজুক। কড়াই-এ জিরে ফোড়ন। আমি বোরলি মাছ ভাজা খেতে ভালোবাসি। বাবা ভিজে পৈতে

বুকে জড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে থাকে। আবার মেঘ ঘন হয়। মাছের ঝোলও!

বৃষ্টি হলে আমার জ্বর হয়, পেটে ব্যথা হয়। আবার কিছুই হয় না। স্কুল বাতিল অপেক্ষামাত্র। বাবা অফিসে চলে গেলে আমার স্ফূর্তি বেড়ে যায়। মেঘ ডাকে। আঁধার করে আসে। টুক করে আলো জ্বালি। মা পইপই করে বলে বাড়িওয়ালা কিছু বলবে। আমি বলি, বারে অন্ধকার যে! কী করে অঙ্ক করব? সারা বছর যে আমি অঙ্ক বুঝতাম না, সেই আমি মেঘলা আকাশে অঙ্ক খাতার পাতা ছিঁড়ে নৌকো বানাই। সব সংখ্যা ডুবে যাক, ভেসে যাক যোগ-বিয়োগ-গুণ- ভাগ-সরল একের পর এক ভুলচুক লাল দাগ।

ঘরে হলদে বাল্ব জ্বলে। সাদা কালো টিভির পেছনের ঝুল দে দোল দে দোল। পোস্টারে মারাদোনার থাইল্যান্ডে আলো পড়লে আমি নিজের দিকে তাকাই। অঙ্ক গেল, গোলও গেল দূরে। মা সঞ্চয়িতা এগিয়ে দেয়। 'নববর্ষা' কীভাবে মুখস্থ হয়ে যায় বুঝতেই পারি না। নাচতে নাচতে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ছাতা নিতে ভুলি না কিন্তু। নয়ানজুলি থেকে মাছ ধরতে সেটাই যে ভরসা। মা ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে ভুলে যায়। যখন বাড়ি ফিরি দেখি বাল্বের আলো সরের মতো ভাসছে। হৃদয় সামলে নিয়ে আসা জিওল মাছগুলি বারান্দার বালতিতে দিব্বি খেলা করে। মা রাখতেও চায় না, আবার ফেলতেও পারে না। ঝুপ করে আঁধার নামে মেঘনাদে। কখন সন্ধে হল ঠিক বোঝা না গেলেও, বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে লোক এসে বাতি জ্বেলে দেয়। বাবা স্কুল থেকে ফেরার পথে ডিম নিয়ে আসে। সেই ডিমের ঠোঙায় অঙ্ক পরীক্ষার খাতা। অশ্বডিম্ব!

রবীন্দ্রনাথের সময়েও মাস্টারমশাইদের শরীর খারাপ হত না। জ্বর হত না। মনকেমন? একদিন ছাত্র না পড়িয়ে কেন যে খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে না তাঁদের! আমার কিচ্ছু করার নেই। স্যারের হিরো সাইকেল বারান্দায় উঠে আসে। দরজার কোণে ছাতা রাখতে রাখতে জলের ধারা গড়িয়ে মিশে যায় উঠোনের জলে, চটের বস্তায় পা মুছে স্যার আসন গ্রহণ করেন। মা বেশি লিকার, মিষ্টি দিয়ে চা দেন তৎক্ষণাৎ। আর বাবা এসে রেখে যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ। খেলার পাতা আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। হলদে আলোর বাল্বে অদ্ভুত ছায়া। মাথা সরাই। ছায়া সরে যায় দেয়ালে। টিকটিকি কথা বলে। পড়ায় কিন্তু একদম মন নেই। এই সময়ে আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে। কই মাছ ধরে ফেলে বন্ধুদের চিৎকার বৃষ্টির শব্দের মধ্যে মিশে যায়। সিঁড়িভাঙা অঙ্ক কিছুতেই মেলে না। উত্তর মেলাতে মেলাতে হুট করে হলদে আলো চলে গেলে শোনা যায় টিনের চালে হাওয়া আর জলের শব্দ। প্রিয় লোডশেডিং!

হ্যারিকেনই ছিল। মানে লন্ঠন। কিন্তু মাস্টারমশাইদের জন্য মোমবাতি রাখতে হত। হ্যারিকেনের গা বেয়ে কেরোসিনের রস। ভালো লাগে না দেখতে। মোমবাতি জ্বালতে জ্বালতে মাস্টারমশাই-এর মন উদাস। কতটুকু হল, কিছুই পারো ন— বলতে ভুলে যান বুঝি। পেপারের শব্দগুলো আবছা। এদিকে মোমের আলোয় ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা নিয়ে আসে। মরে যায়। খাতার ওপর পোকাদের চালের কাঁকড়ের মতো সাজিয়ে রাখি। মাস্টারমশাই কিছু বলেন না। সময় কাটে। বৃষ্টির শব্দ রেডিও-র মত কমে-বাড়ে। বাবা কোথায় গেছে জানি না। নিশ্চয়ই অফিসের কাজ করছে। কোনও বৃষ্টির জল বাবাদের রাগ কমাতে পারে না। মায়েদের রান্নাঘর থেকে ছুটি দিতে পারে না। আর পারে না পড়তে বসা কিশোর-কিশোরীদের চোখ কচলানো আটকাতে।

মাস্টারমশাই চলে গেলেই ছাতা মাথায় ছলাৎ-ছল দৌড়, উঠোন পেরিয়ে দাদা-কাকার ঘরে। খিচুড়ির গন্ধ ভুরভুর, আর ব্যাঙ তাড়ানোর ব্যস্ততা। দরজায় কুপি জ্বালিয়ে রাখা যাতে কোনও পোকা-মাকড়-লতা... ঘরময় হাঁটলেই জলছাপ, আল্পনা। সরব শূন্যতা। কানাঘুষো শোনা যায় আজ রাতে আর কারেন্ট আসবে না। ইলেকট্রিক অফিসকেই লাইট হাউস ভেবেছি আমরা, হঠাৎ

বারান্দায় এসে দেখি উঠোনের জলের ওপর ভাসছে ‘চাঁদের আলোর সর’। হাওয়ার শিহরণ। চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে মেঘ। ভাল লাগার ভয় গ্রাস করছে। চালতা গাছের ওই দিকটায় তাকানো যাবে না। ওখানেই... এই ঘোরবর্ষণে আত্মারা ভেজে না? নাকি অপমৃত্যুতে অচরিতার্থ জীবনের পিপাসা কোনও মৌসিনরামেই মেটে না? বালিশের নিচে তিনবার রামনাম লিখে ঘুমোতে হবে... কিন্তু সেই স্বপ্নটা আবার যদি দেখি, একজন লোক যার মুখ দেখতে পাই না বলছে পাঁচিলের গায়ে হিস কর। সারা পৃথিবীতেই জল ঝরছে, অথচ বিছানায় পেচ্ছাব করলে মা ওই মাঝরাতেই গুপগাপ পিটন দেবে। বলবে— দেখছিস তো জামাকাপড় শুকোচ্ছে না, আবার আরেকটা ভারি বেড কভার... এই কথাবার্তার মধ্যেই বাবার ঘুম যাবে ভেঙে। আলো জ্বালবে। বলবে ঘুমচোখে— উল্লুকের বাচ্চা। আমি ওই আলোতেই মটকা মেরে থাকব, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মানুষের বাচ্চা হিসেবে ভাবতে পারব না; কেন না তারা বড় হয়ে বিছানায় হিসু করে না।

ছোট পরিবার সুখী পরিবার মনে হত রাত্রে খাবার সময়। বাবা রোজ দেরি করে খাবার পাতে বসত। মা ডাকতেই থাকত, বাবা সিগারেটে সুখটান দিয়ে পেপার দেখত। মা বলত— এতক্ষণে কালকের কাগজ ছাপা হচ্ছে। বাবা বসলেই মা রান্নাঘর থেকে সব খাবার বড় ঘরে নিয়ে আসত। ছোট ঘর বলতে যেটি ছিল সেখানে থাকত ঠাকুর, আরশোলা, তক্তপোষের ওপর মাসকাবারের জিনিস, শিশি-বোতল, পুরনো সেলাই মেশিন ইত্যাদি। আর তক্তপোষের নিচে সেইসব জিনিসপত্র, যেগুলো আসলে বাতিল, কিন্তু মায়েরা যে কিছুই প্রাণে ধরে ফেলতে পারে না। টিনের কৌটার ভেতর কিছু পেরেক, বিখ্যাত ভারি ট্রাঙ্ক, কাঠের ছোট বাক্স, ভাঙা ছবির ফ্রেম...। এই ঘরেও একটা বাল্ব জ্বলত, তবে সেটা কম পাওয়ারের। ফলে এই ঘরের বিষণ্ণতাবোধ ছিল একটু বেশি। ঘরে কেউ এলে জামাকাপড় পালটানো আর সন্ধ্যেবাতি দেওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাল্ব অফ থাকত। ঘুলঘুলি দিয়ে চাঁদের আলো। আমার কেবল মনে হত একা ঘরে থাকতে ঠাকুরদের ভয় করে না!

এক থালা ভাত আর গোটা ডিম খেয়ে নিজের পেট দেখতাম। মা বলত, নজর দেয় না। আর বাল্বের আলোর সামনে বাবার সিগারেটের ধোঁয়া কেমন রেখা এঁকে দিত। আমি সাদা রং চটা দেয়ালের মধ্যে সিংহ খুঁজতাম। মশারি টাঙানো হলে আলোর ঘুম চোখ। কখন ঘুমের দেশে যেতাম, জানতেই পারতাম না।

একদিন প্রতিদিন বড় হতে থাকলাম। ঘরে টিউব এল। সাদা আলো ঝকঝক করছে। কিছু লুকোবার জো নেই। বাল্ব বেশি কারেন্ট খাবে বলে দু-একটি পয়েন্ট বাদ দিয়ে সবখানেই বাতিল হতে শুরু করল। এরপর ওই আলোর লোভে কোনও কোনও বৃষ্টিরাতে বাথরুমে যেতাম। কলঘর পার করে আলো আবছা হত উঠোনে এসে। ইট, শ্যাওলা, ব্যাঙ, জলের বিন্দু সব কিছু হলুদ আলো শুষে নেয়। কাঁচের ওপর আঠা জমত রান্নাঘরের বাল্বে। ফলে আলোর ঘনত্ব যেত পালটে। আমার আবার ওই রান্নাঘর, জনতা স্টোভ, কেরোসিনের টিন, ছোট্ট কাঠের আলমারি, শিলনোড়া সমেত আলো মাখতে ইচ্ছে করে। মায়ের আঁচল দিয়ে মুখ মোছার মত স্নিগ্ধ, শান্ত।

এখনও মাঝেমাঝে বৃষ্টিভরা রাতে আলোভাসি উঠোনে হাঁটি। দেখতে পাই সেই সবকটা মায়াবি বাল্ব আমার সমস্ত মনখারাপকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। হারানো সুর মিশে যায় আকাশে। শুধু কখনও ওই হলদে আলো বর্ষামঙ্গলে ফিরে এলে মনে হয়— কোথাও না কোথাও ফিরে আসা থাকেই। মনের, মনখারাপের, বিষণ্ণতার কিংবা হলদে বাল্বের!

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। চতুর্থ অধ্যায়। ২য় ভাগ

সার্জন রেনী’র

‘ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি’

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

কুমারকাটা/সিদলি/পাখিহাগা/বিষেণসিং অভিযান:

১৭ই ডিসেম্বরে দেওয়ানগিরির ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কর্ণেল ক্যাম্বেলের নেতৃত্বে সেখানে একটি সেনাশিবিরে ৬ কোম্পানি সেনাকে রাখা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টার কিন্তু কর্ণেল রিচার্ডসনকে গোয়ালপাড়া থেকে রওয়ানা দিয়ে সিদলি অভিমুখে যাত্রা করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিদলিতে মুলকাস্টারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবে। এ নির্দেশ পাঠিয়ে তিনিও সিদলি অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন। সঙ্গে দু’কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন কর্ডনার এবং লে. হেলার। রওয়ানা দিয়ে সেদিনকার মত তাঁরা কুমারকাটাতে অস্থায়ী শিবির করতে মনস্থ করেছিলেন। কারণ, পথিমধ্যে নয় জন ইউরোপীয়ান সহ বেশ কিছু সেনা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কর্ণেল রিচার্ডসন ও জেনারেল মুলকাস্টার গোয়ালপাড়া থেকে ৪২ মাইল দূরে সিদলিতে মিলিত হয়েছিলেন। মধ্যভাগের দলটি জঙ্গল ও পাথুরে পথ পেরিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিষেণসিং-এ, ৫ই জানুয়ারিতে।

৮ই জানুয়ারিতে সুরানভাঙা নদীর তীরে পাখিহাগা গ্রামটি ছিল বিষেণসিং থেকে চার মাইল দূরে। জেনারেল মুলকাস্টার ৩০০ সেনা নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এক বৃদ্ধ লামা পুরোহিতের পাথুরে বাড়িটি দখল করে নিয়েছিলেন। এখানেই আঙদু ফোরাঙের জুঙপেনের একটি অস্থায়ী আবাস ছিল। এখানে নদীতে মাছ ধরতে আসতেন তিনি।

সুরানভাঙা (সরাইডাঙ্গা?) নদীর কাছাকাছি পাখিহাগা গ্রাম। নদীতে প্রচুর মাছ। বিষেণসিং গ্রামটিও পাহাড়ের খাঁজে অবস্থিত। এখান থেকে পূর্বদিকে ৩০ মাইল দূরবর্তী চেরাং-এ যাওয়া যায়। আর চেরাং-এ থাকেন এক জুঙপেন। পাখিহাগার চারপাশে গভীর অরণ্য। সে বনভূমিতে আছে শাল, সেগুন, ওক প্রভৃতি মূল্যবান বনরাজী। কিন্তু জনবসতির চিহ্ন কোথাও নেই।

পাখিহাগায় বেশিদিন কাটানো হয়নি। দুই স্কোয়াড্রন সেনাকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। তিন কোম্পানি সেনা রাখা হয়েছিল বিষেণসিং-এ। সিদলিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা হয়েছিল। জেনারেল মুলকাস্টার ফিরে গিয়েছিলেন গৌহাটিতে।

সিদলিতে সেনাবাহিনীর সিভিল অফিসার মি. মেটক্যাফকে একটি চিঠি লিখেছিলেন সিদলির তথাকথিত এক রাজা। ভদ্রলোক বাঙালি। ভুটান সরকারের অধীনে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন এদিকে। তিনি লিখেছিলেন, অসম-ডুয়ার্সের এই জনপদকে সিদলি বলা হলেও, ভুটানি নাম হল চেরাঙ। ভুটানের রাজা ওই ভদ্রলোকটিকে নিয়োগ করেছিলেন। এ জনপদের খাজনা আদায় করে ভুটানের দরবারে পাঠানোই তাঁর কাজ। এ জন্যে তিনি ভুটানরাজকে বার্ষিকভাবে অর্থ প্রদান করেন উপঢৌকন হিসেবে পাঠান শুটকি মাছ, কাপড়-চোপড় ও নানাবিধ সামগ্রী। এভাবে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তিনি বহু লোকজনের নাম ও তাদের গ্রামের নাম জানেন। সেখানকার অজ্ঞ লোকেদের কাছে তিনি বহুদর্শী লোক হিসেবে খ্যাতিমান। ভুটান সরকারের নির্দেশ এসেছে গাঁয়ের কেউ যেন সেনাবাহিনীকে গোরু-ছাগল বিক্রি না করেন। এটা যে জনসাধারণের অজ্ঞতা তা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে হিন্দু, তাই গো-হত্যা সমর্থন করেন না।

মি. মেটক্যাফ গোটা বিষয়টাকেই অজ্ঞতা বলে মনে করেন। সিদলি ও বিষেণসিং-এর মাঝামাঝি এলাকায় লোকবসতির চিহ্নমাত্র নেই। শুধু অরণ্য আর অরণ্য। শাল, সেগুন গাছের ঘন বন। বনের গভীরে অসংখ্য ঝরনা। সিদলিতেও বসতি কম।

বেঙ্গল ও অসম ডুয়ার্স দখল প্রায় সম্পন্ন হল। ভারত সরকারও ফেব্রুয়ারিতে গোড়ারদিকে সেনাবাহিনীকে ডুয়ার্স ত্যাগের নির্দেশ দিল। কিছু কিছু অশ্বারোহী সেনাকে অবশ্য বিভিন্ন পার্বত্য ঘাঁটিতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। অধিকৃত অঞ্চল ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে জেলায় পরিণত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ভুটানের যুদ্ধ শুরু

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেছেন। এবার দেবরাজার পূর্বোক্ত চিঠি অনুসারে যুদ্ধ শুরু করে দিল ভুটান— চামুর্চি থেকে দেওয়ানগিরিতে। বহুবার সতর্ক করে দিয়েই ভুটানের এই যুদ্ধ ঘোষণা। শত্রু ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করেছিল বিশ্ববিজয়িনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারাণী।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে বান্দু নামে একজন ভুটানি ছেলে দেওয়ানগিরির এক আত্মীয়কে চিঠি লিখে একটা খবর জানিয়েছিল। ওই চিঠিটি ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে এলেও সেটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

ওই চিঠি থেকে জানা গিয়েছিল যে, বান্দুংয়ের জুঙপেনের গবাদি পশু চরানোর কাজ করত সে। ব্রিটিশ সেনার আগমনের কথা শুনে সে পশুদের দেওয়ানগিরি থেকে সলেখা নামক একটি স্থানে নিয়ে এসেছিল। দেওয়ানগিরি থেকে সলেখা দু'দিনের পথ। সে এসে দেখে যে, সলেখা থেকে জুঙপেন চলে গিয়েছেন। ছেলেটি এবার পশুদের নিয়ে কী করবে, তা জুঙপেনের কাছে খবর পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিল।

জুঙপেন ডিসেম্বর মাসেই সলেখাতে এসেছিলেন। তিনিও শুনেছিলেন যে, ব্রিটিশ বাহিনী দেওয়ানগিরিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। তাই তিনি টংসোর পেনলোকে খবরটা জানিয়েছিলেন ও তাঁর নির্দেশ চেয়েছিলেন।

টংসোর পেনলো ওই চিঠি পেয়েছিলেন ডিসেম্বরের শেষের দিকে। তিনি প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, তিনি শিগগিরিই সৈন্য সামন্ত নিয়ে সলেখাতে নয় দিনের মধ্যে আসবেন। তার সঙ্গে থাকবে ৬০০ সৈন্য।

ওই খবরটি জুঙপেনের কয়েকজন অনুগামীর আলাপ-আলোচনার সময়ে শুনতে পেয়েছিল বান্দুং। খবরটি সে গোপনেই রেখেছিল। কারণ, সে দেওয়ানগিরিতে তার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। ওই স্থান থেকেই তো সে চলে এসেছিল। তাই ওই খবরটি সে বাড়িতে জানিয়েছিল।

বান্দু-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, এদিকে জুঙপেন নিজেও টঙসো রোডে দেওয়ানগিরি ও

সলেখার মাঝামাঝি জায়গায় ১০০ সেনার একটি চৌকি স্থাপন করেছেন। একই ধরনের সেনা চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথেও। ওই গিরিপথের ঝরনা থেকে ব্রিটিশ সেনারা কাঠ (বাঁশ) দিয়ে একটা কৃত্রিম নালা করে পানীয় জল সংগ্রহ করত।

যে স্থানীয় কৃষকটির হাত দিয়ে বান্দুং চিঠিটি পাঠিয়েছিল, কৃষকটি ওই খবর গ্রামবাসী সকলকে জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। এছাড়াও টঙসোর পেনলো তিব্বতি ভাষায় দেওয়ানগিরির সৈন্য শিবিরে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দেওয়ানগিরিতে তিব্বতি ভাষা জানা কোনও অনুবাদক না থাকায় ওই চিঠির মর্মোদ্ধার করা যায়নি। চিঠিটি ২০০ মাইল দূরবর্তী দার্জিলিং-এ পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ছেবু লামা ওই চিঠিটির মর্মোদ্ধার করতে পারবে, এটাই ছিল প্রত্যাশা। পরে জানা গিয়েছিল যে, টঙসোর পেনলো ব্রিটিশ বাহিনীকে এক সপ্তাহের মধ্যে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা না হলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন।

এদিকে যুদ্ধ জয় সম্পন্ন হয়েছে ভেবে এবং কোনও ভয়ের আশংকা নেই জেনে ২৯শে জানুয়ারি (১৮৬৫) সৈন্যবাহিনী দেওয়ানগিরি চলে যায়। থেকে যায় সামান্য কিছু ব্রিটিশ সেনা।

দেওয়ানগিরির যুদ্ধ

৩০শে জানুয়ারি ভোরবেলা পাঁচটা নাগাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গিয়েছিল। যা শুনে অনেকেরই মনে হয়েছিল, কারো গরু হয়ত পালিয়ে গেছে। সবাই গরুটিকে ধরবার জন্য ছুটছে।

একটা তাঁবুতে আরামে ঘুমিয়ে ছিলেন লে. স্টোরে এবং পিট। কলরবের শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আর ওই মুহূর্তেই তাঁদের তাঁবুর রসিগুলি কেউ কেটে দিয়েছিল। ওঁরা চোখ খুলে দেখেন যে, কয়েকজন ভুটানি ওই কাজ করছিল। আর কালবিলম্ব না করে তাঁরা দৌড়ে বিপরীত দিকে পালাতে শুরু করে। আর ওই মুহূর্তেই শুরু হয় আক্রমণ।

ইউরোশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনী গোলা ও গুলি বর্ষণ শুরু করলে ভুটানি সেনারা সকাল পর্যন্ত চুপচাপ থাকেন। ডা. ক্যাম্বেল ছিলেন জ্বরে অসুস্থ। তবুও তিনি ৪৩নং সেনাদের সাহায্যে ভুটানিদের তাড়িয়ে দিলেন। ভুটানিরা তখন পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে। সেনারা জুঙপেনের বাড়ি আক্রমণ করলেন। মি. সার্ভির নেতৃত্বে ওই বাড়ি থেকে ভুটিয়াদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনীর লে. আরকোয়ার্টের ঊরুতে একটা বড় গুলি এসে লাগে এবং তিনি রক্তক্ষরণের কারণে দ্রুত মারা যান। শল্যচিকিৎসার সুযোগই পাননি তিনি। গুলিবিদ্ধ স্থানে একটা কাপড় শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে হয়ত তিনি শল্যচিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে পারতেন। ওই যুদ্ধে ৪৩ নং বাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট লে. স্টোরেও আহত হন। নিহত হন চারজন এবং আহত ব্রিটিশ সেনা ৩১ জন।

ওই আক্রমণটির মূলে ছিলেন টঙসোর পেনলো স্বয়ং। তাঁর সচিব ছিলেন এক বৃদ্ধ এবং ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত ভদ্র। তিনি বুকে আঘাত পেয়ে দারুণভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁকে বন্দি করা হয়েছিল। মৃত্যুর আগে জবানবন্দিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি অসমিয়া ভাষায় লেখা কাগজপত্র অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। ওই কাগজপত্র দেখে জানা গিয়েছিল যে, গোটা আক্রমণটি পরিচালনা করেছিলেন টঙ সোর পেনলো।

অনুমান করা হয় যে, ওই যুদ্ধে ষাটজন সেনা মারা যায় এবং আহতের সংখ্যাও প্রচুর। বন্দি ভুটানি সেনারা ফর্সা ও মজবুত গড়নের। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, ওরা তিব্বতের কাম্পা জেলার অধিবাসী। পেম্বারটন এঁদের কথাই বলেছিলেন। এঁরা বাংলা ও অসমে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকেন। অসমের হাজো থেকে ওঁরা রংপুরে যেতেন। নিম্ন অসমে ব্রহ্মপুত্র (গৌহাটি) থেকে ৬ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের ডান

দিকে হাজোর অবস্থান।

যদিও ভুটানিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা কিন্তু হেরে যাননি। কারণ, তারা পরবর্তী তিন দিন ধরে হামলা চালাতেই থাকেন। তারা পূর্বে উল্লিখিত জলের উৎস বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ওরা ফেব্রুয়ারিতে তারা ব্রিটিশ সেনার এক সেনাছাউনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং রাতে তারা ডুরুংগা গিরিপথ দখল করে সমতলে যাবার পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন। ব্রিটিশ সেনা শিবিরে প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দিয়েছিল। কাছাকাছি একটা ক্ষীণতোয়া ঝরনা ছিল, সেটিও শুকিয়ে গিয়েছিল। ভুটানি সেনারা যে স্থান দখল করেছিলেন, সেখান থেকে তাদের তাড়ানো সম্ভব নয়।

তখন জেনারেল মুলকাস্টার ছিলেন গৌহাটিতে। কর্ণেল ক্যাম্বেল ৩০শে জানুয়ারিতে তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, আরও সৈন্য আবশ্যক। তিনি অবশ্য জানতে পেরেছিলেন যে, দেওয়ানগিরিতে সেনা পাঠানোর পর আর গৌহাটি থেকে সেনা পাঠানো সম্ভব নয়। তবুও তিনি চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলেন। তাঁর গোলাবারুদ দ্রুত কমে আসছে। অবশেষে ২৫ রাউন্ড গুলি নিয়ে দেশিয় পদাতিক বাহিনীর ৩৬ জন সেনা আসছেন শুনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ওই বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন কান্‌লিফ মনে করেন যে, বেশি পরিমাণে গোলাবারুদ নিয়ে ওই সংকীর্ণ গিরিপথ দখলের চেষ্টা উচিত কাজ হবে না। যদি ওই রসদ ভুটানিদের হাতে পড়ে যায়, তাহলে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। তাই তিনি দলটিকে কুমারকাটায় অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে দেওয়ানগিরি সেনা শিবির সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। এদিকে প্রচণ্ড জলাভাব। ডা. ক্যাম্বেল ওই রাতেই চুপিসারে ওই স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিব্রা গিরিপথ দিয়ে ঘুরে পুনরাক্রমণ করবেন বলে মনে মনে ভেবেছিলেন। দুরুঙ্গা গিরিপথ দিয়েও আক্রমণ হতে পারে। ২৫০ জন্য সেনা আহতদের বহন করবেন, ৫০ জন বন্দুকাদি বহন করবে, বাকি ২০০ সেনা এগিয়ে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। রাত একটা নাগাদ পিছু হটল ব্রিটিশ সেনা।

ভয়, বিদ্রোহ ও অমানবিকতা:

পাঁচটি গিরিপথ দিয়ে দেওয়ানগিরিতে আসা যায় এবং সেখান থেকে বাইরে যাওয়া যায়। তাই লিব্রা গিরিপথের খোঁজ চলছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারিতে রাত একটার সময়ে শিবির পরিত্যাগের মুহূর্তে শিবিরে থাকা কিছু সেনা ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে ভুটানি সেনাদের বোঝাতে চেয়েছিল যে, তারা ওখানে আছে।

কিন্তু প্রধান দলটি দুর্ভাগ্যবশে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল গভীর আতঙ্ক। আতঙ্ক থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল বিশৃঙ্খলা। ওই অবস্থায় আহত সেনাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে, বন্দুক ফেলে দিয়ে কেউ কেউ পালিয়ে যান। ৪৩ নং বাহিনীর সৈন্যরাও আর বন্দুক বহন করে নিয়ে যেতে অস্বীকার করতে থাকে। ২০ জন ইউরেশিয়ান বন্দুকবাহিনীর সেনা ওদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। ওই অবস্থায় ক্যাপ্টেন ককরান ওই বিদ্রোহী ও আহত সেনাদের গিরিখাতে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। শত্রুর হাতে পড়ার চাইতে হিমালয়ের সংকীর্ণ গিরিখাতে ফেলে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু, সার্জেন রেনী পরে জানতে পেরেছিলেন যে, ওই দুর্বুদ্ধি কোনও উপকার করেনি। টঙসোর পেনলোর সেনারা ওই বন্দুকগুলি খুঁজে পায় এবং ওই অস্ত্রশস্ত্র পেনলোর কব্জায় চলে যায়।

রাতের ঘন অন্ধকারে, হাজারো বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চিয়তার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাহিনী অবশ্য কুমারকাটায় পৌঁছেছিল। সকলে শ্রান্ত, ক্লান্ত, রসদবিহীন এবং অস্ত্রবিহীন। আবার কিছু সেনা ভুটানি সেনাদের হাতে ধরাও পড়েছিলেন। কয়েকজন ভুটিয়া আক্রমণে সাংঘাতিকভাবে আহতও হয়েছিলেন।

দেওয়ানগিরি শিবিরে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ছিল, ভুটিয়া সেনারা তা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সম্ভার পেয়ে ভুটানিরা মহাখুশি।

ব্রিটিশ বাহিনী শিবির ত্যাগের পরে টঙসোর পেনলো কুমারকাঁটা শিবিরের আধিকারিকের উদ্দেশে একটা মজার চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওই চিঠিতে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি ভুটিয়া সেনাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, এবং একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, ভুটানিদের হাতে বন্দি ব্রিটিশ সেনাদের তাঁরা বেশ যত্নেই রেখেছেন। তিনি ব্রিটিশবাহিনীর হাতে বন্দি ভুটানের সেনাদের সেবাযত্নের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে, ব্রিটিশদের কাছে যথোচিত উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন।

কুমারকাটা শিবির থেকে পাঠানো হয়েছিল এক সংবাদপাঠককে। টঙসোর পেনলো ওই সংবাদবাহককে সদয় ব্যবহারে আপ্যায়িত করেছিলেন। ভালভাবে খাবারদাবার দিয়েছিলেন এবং তাকে উপহারও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কোনওভাবে ওই গুপ্তচরকে সামরিক শিবির ও অস্ত্র ভাণ্ডারের কোনও সন্ধান দেননি।

টঙসোর পেনলো দেওয়ানগিরির সেনা কর্তৃপক্ষকে প্রকৃতপক্ষে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। তাছাড়া ৪৩ নং অসম লঘু পদাতিক বাহিনীও সম্ভবত কালিমামুক্ত ছিল না। ওরা এ যুদ্ধের পূর্বে কোনও যুদ্ধে যোগদান করেননি। গৌহাটির নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে খুব দ্রুততার সঙ্গে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই লোকগুলো শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু কোনও জটিল মুহূর্তে তারা অন্ধকারে অরণ্য-শ্বাপদ সংকুল পার্বত্য পথে, পথ না চিনলেও, হারিয়ে যেতেন। তারা বুঝতে চাইতেন না যে, তাদের চারপাশে শত্রুপক্ষীয় বহু লোক আছে। ওই আতঙ্ক তাড়িত সৈনিকরা লঘু দণ্ড গ্রহণেও আপত্তি করতেন না।

ক্যালকাটা ইংলিশম্যান পত্রিকার মূল্যায়ন:

টঙসোর পেনলো যে ভুটানের ওপারের কিছু দেশ বা লোকের সাহায্যে শক্তিমান হয়ে উঠেছিলেন, তা 'ক্যালকাটা ইংলিশম্যান' পত্রিকার বিশ্লেষণে ধরা পরেছিল।

'ভুটানিদের সাথে আমাদের সর্বশেষ সংঘর্ষ এ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। প্রথমত আমরা বিশ্বাস না করলেও, তারা যে আমাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরি করতে পারে, তা প্রমাণিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত তাদের সামরিক সাংগঠনিক পদ্ধতি বেশ উন্নত। তৃতীয়ত আমরা বিশ্বাস না করলেও, ভুটানের অভ্যন্তরীণ সঞ্চিত খাদ্যসম্ভার বেশিই আছে। চতুর্থত সৈনিক হিসেবে গুলিগোলার মধ্যেও তারা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে কিন্তু পাশাপাশি থেকে হাতে হাত মিলিয়ে তারা লড়াই করতে পারে না। পঞ্চমত তারা তীরধনুকে এবং গুলি চালনায় অনেক বেশি লক্ষ্যভেদি। তীরধনুকে তারা আমাদের সমতলের পদাতিক বাহিনীর চাইতে বেশি দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। ষষ্ঠত টঙসোর পেনলোর সীমানার মধ্যে এমন কোনও ক্ষুদ্র জনপদ নেই, যেখান থেকে পেনলোর সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো অভিপ্রায় দেখায়নি স্থানীয় মানুষজন। ৩০ শে জানুয়ারি ও ৩রা ফেব্রুয়ারিতে দেওয়ানগিরিতে যারা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। এরকমই একটা বড় বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, যাদের সবাই ছিলেন যোদ্ধা। সপ্তমত আওয়াস বা মালবাহক, লোপাস বা কুলি, সঙ্গীতবাদক বা সেবক সবাই ছিলেন ওই বাহিনীর স্তম্ভ।

সেনাবাহিনীর যে লোকেরা সম্ভ্রান্তবংশীয়, ফর্সা, দীর্ঘ অস্থি বিশিষ্ট, ওই লোকেদের সংগ্রহ করা হয়েছিল তিব্বতি ভুটানের এলাকা থেকে এবং তারা কাম্পা নামে পরিচিত। এদের সংখ্যা মনে হয় ১৫০০'র বেশি নয়। গাদা বন্দুকে তারা সজ্জিত। আওয়াস বা মালবাহকেরা আহত লোকদের পিঠে বহন করতে পারদর্শী। আবার পিঠে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে পিঠে বহন করতেও ওরা ওস্তাদ। কুলিরা খুঁটি দিয়ে বেড়া বাঁধতে কিংবা কাঠের খুঁটিও

বহন করতে পারে। সঙ্গীত বাদকেরা সেনাদের মনোবল বাড়াতে ও উত্তেজিত করতে পারে। প্রত্যেক সৈনিকই তার পোশাক, ১০০-১৫০ বুলেট, তিন সের (৬ পাউন্ড) চাল, শুকনো মাংস এবং ১০-২০টি একই আকৃতির পাথর বহন করতে পারে। এই পাথর ছুঁড়ে তারা মানুষ আহত তো করবেই, মেরেও ফেলতে পারে।

তাদের আক্রমণের ধারাও প্রশংসনীয়। এমন একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে, যেখান থেকে চারদিকে নজর রাখা যাবে এবং আক্রমণ করা যাবে। ভুটানের পাহাড়গুলো ছোট ছোট এবং একটা থেকে অন্যটার খাদ গভীর জঙ্গলে আবৃত। অবস্থানের স্থানটি হবে উঁচুতে এবং রাতে থাকবে নৈঃশব্দ। ওই স্থানটি গাছ কেটে, ডালপালা ফেলে ঘিরে নিরাপদ করা হবে। খোঁয়াড়গুলো হবে ১২ ফুট বর্গাকার এবং ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু। খোঁয়াড় থেকে নিচে নেমে পাহাড়ের খাঁজে যাতায়াতের পথ করে নেবে তারা। পাশাপাশি আরও একটা খোঁয়াড় তারা তৈরি করবে, চারদিকে আক্রমণ শুরু হলে, যেখানে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা যাবে। অবরোধকারীরা ওই স্থানের সন্ধান কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহেও পাবে না। এভাবেই তারা পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছিল।

এভাবে লুকোচুরি বা আত্মগোপনের অনুশীলনও করা হয়। দুর্গের অধিপতি বা আধিকারিকেরাও ওই অনুশীলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। দেওয়ানগিরির যুদ্ধে আমাদের আধিকারিকদের সাথে ভুটানের আধিকারিকদের মাঝে মধ্যে এমন দ্বৈরথ হয়েছিল এবং ভুটানিরা সব সময়ে জয়ী হননি। ওই দ্বৈরথ অবশ্য হয়েছিল তীরধনুকের সঙ্গে বন্দুকের। কিছু কিছু সৈনিকের শিরস্ত্রাণে বাঁশের চৌকো তীক্ষ্ণ শলা ঢুকে গিয়েছিল। লোকজনদের মাথায় ছিল পাগড়ি এবং ওই স্বাস্থ্যবান সৈন্যরা ছিল দৈত্যের মত দেখতে।'

পত্রিকার প্রতিবেদক হয়ত জানতেন না যে, কাম্পা সৈনিকদের তিব্বতি বলে উল্লেখ করা হলেও, তারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন টঙসোর পেনলোর রাজ্যেরই অধিবাসী, ভুটানি। আর যদি ওই লোকেরা তিব্বতেরই অধিবাসী হয়ে থাকেন, তবে তিব্বতের স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পেনলোর সঙ্গে বন্ধুত্বের বশে কিছু সাহায্য-সহযোগিতাও করে থাকবেন।

দেওয়ানগিরির যুদ্ধ মনে হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা এবং চামুর্চি থেকে শুরু করা অভিযানের একটা প্রথম সামরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রচেষ্টা।

বিষেণসিং/বক্সা/তাজাগাঁও/চামুর্চিতে যুদ্ধ: ২৫ শে জানুয়ারিতে প্রায় কয়েক শত সেনা আক্রমণ করেছিল বিষেণসিং দুর্গ। গভীর জঙ্গলের ভেতরে ব্রিটিশ বাহিনীর তৈরি খোঁয়াড়ের সামনে ভুটানি সেনারা না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ শুরুই হয়নি। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভুটানি সেনারা এগিয়ে এলে, তিন কোম্পানি ব্রিটিশ সেনার মোকাবিলা করতে না পেরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সিলেটের ৪৪ নং পদাতিক বাহিনীও অবশ্য ওই সময়ে সেখানে অবস্থান করছিল। দু'জন ভুটানি তীরন্দাজি সেনার আঘাতে দু'জন ব্রিটিশ সেনা আহত হয়েছিলেন। ভুটানি সেনাও কয়েকজন আহত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল।

২৬শে জানুয়ারিতে ভোর তিনটের সময় ভুটানিরা বক্সা দুর্গ আক্রমণ করেছিল। তখন সেখানে ছিল গোর্খা সৈন্যরা। গুলির লড়াই চলেছিল সকাল পর্যন্ত। সকালবেলা দেখা গেল, ভুটানি সেনারা নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় আছেন। সেখান থেকেও তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বল্লা গিরিপথে ভুটানি সেনারা একটা সেনা খোঁয়াড় তৈরি করেছিলেন। স্থানটির নাম তাজগঙ। ২৭ শে জানুয়ারিতে সকালবেলা ১১ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনী নিয়ে লে. মিলেট সেটি আক্রমণ করেন। ভুটানি সৈন্যরা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে এগিয়ে

গিয়ে নিজেদের তৈরি করা দুর্গে আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশ সেনারাও একই আত্মপ্রত্যয়ে লড়াইয়ে নামে। তাদের একজন সিপাহী নিহত হন ও আহত হন ছয় জন সৈনিক। ভুটানি খোঁয়াড়েও একজন মৃত সেনাকে পাওয়া গিয়েছিল। ভুটানিরা পরে অবশ্য তাদের সেনা খোঁয়াড়টি পুনরায় দখল করে নিয়েছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে কর্ণেল ওয়াটসন এক পদাতিক বাহিনী নিয়ে সেটি পুনরায় আক্রমণ করেন। সঙ্গে ছিল বন্দুক ও মর্টার বাহিনী। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেও তাজগঙ আর পুনরুদ্ধার করা যায়নি। ওই যুদ্ধে লে. মিলেট নিহত হয়েছিলেন। লে. ক্যামেরুনও সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। ১১ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনীরও বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছিলেন।

একই সময়ে লড়াই শুরু হয়েছিল চামুর্চিতেও। সেখানকার একটি গিরিপথে বেঙ্গল পুলিশের ১৫০ জনের একটি দল পাহাড়ায় ছিল। রাতে ভুটানি সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে একজন প্রহরীকে হত্যাও করেছিল। মেজর পুঘের সেনাবাহিনী চামুর্চিতে এগিয়ে এসে দেখেন যে, একটা পাহাড়ের পরিখায় আত্মগোপন করে আছেন ভুটানি সেনারা। তিনি তাদের তাড়াতে পারবেন না বুঝে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডান্সফোর্ডের কাছে সৈন্য সহায়তা চেয়েছিলেন। ওই প্রত্যাশা অনুসারে ৩০ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১৫০ জন সৈন্য ও দুটি মর্টার তিনি ক্যাপ্টেন হাক্সামের নেতৃত্বে তাঁকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলেন।

সৈন্যরা পৌঁছালে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ভুটানি সেনাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী সমতলে নেবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভুটানিরা পুনরায় আক্রমণ করেন ও স্থানটি নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। বেঙ্গল পুলিশ সেনারা আবার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি কিছু। ভুটানিরা নিরাপদ খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছিল ও পুনরায় প্রত্যাশা পূরণ করেছিল।

ভুটানবাসীর এরূপ আক্রমণ ও সাফল্য যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই সংঘর্ষে তাদের শক্তি উপেক্ষণীয় নয় এ সংবাদ কলকাতায় পৌঁছালে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। এবং ওই মর্যাদা রক্ষার জন্যই কর্তৃপক্ষ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ ও সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবার ডুয়ার্স হয়ে উঠবে আরও ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র।

মেরাট ও কলকাতা থেকে দুই ব্যাটারি ব্রিটিশ কামান বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্মৌ থেকে পাঠানো হয় ৫৫ নং রেজিমেন্টকে, দমদম হেড কোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয় ৮০ নং রেজিমেন্টকে। ১৯ নং, ২৯ নং ও ৩১ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনীকেও পাঠানো হয়।

ডুয়ার্সে তখন যা সৈন্য ছিল, তার সাথে যুক্ত হল ১৩০০ ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনী, ১৬০ নং কামান বাহিনী এবং ২০০০ জন দেশিয় পদাতিক সেনা।

সেনানায়কদেরও পরিবর্তন করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টারের পরিবর্তে গোয়ালিয়র থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টম্বসকে এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডান্সফোর্ডের অসুস্থতার কারণে তাঁর পরিবর্তে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফ্রেজার টাইটলারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে অস্ত্রশস্ত্র সহ দুই ব্রিগেড সেনাকে ডুয়ার্সে পাঠানো হয়েছিল। ২৫ নং ব্রিটিশ কামান বাহিনীর ৩ নং ব্যাটারি, ৫৫ নং রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারের ২৯ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনীকে গৌহাটিতে পাঠানো হয়েছিল। ওদের বলা হয়েছিল যে, ওরা দেওয়ানগিরি পুনর্দখলে যাবে। ২২ নং ব্রিগেডের ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীর সাত ব্যাটারি সৈন্য, ৮০ নং রেজিমেন্ট, ১৯ নং রেজিমেন্ট এবং ৩১ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনীকে বাঁ দিক থেকে আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

ডুয়ার্স হয়ে উঠেছিল প্রকৃত সমরাঙ্গন। এর পরেই শুরু হয়েছিল সার্জেন রেনীর সমরাভিযানও।

(ক্রমশ)

সিকিম যোগ করলে রোজ ক্ষতি ৩০ লাখ টাকা ?

উত্তরের পর্যটনে ঘুরে দাঁড়ানোর রুট চাই !

গৌতম চক্রবর্তী

অপূরণীয় ক্ষতি পর্যটন মরসুমে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এখন পর্যন্ত নেই কোনওরকম সরকারি সহযোগিতা। প্রতিশ্রুতি আছে, নেই তার বাস্তবায়ন। তাই সরকারি ভরসায় নয়, নিজেদের আত্মবিশ্বাসের ওপরেই ঘুরে দাঁড়াতে চায় ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। মার্চ মাসের শেষ থেকে দীর্ঘ লকডাউনে সমস্ত কিছু বন্ধ থাকায় পর্যটনের মরসুমে ক্ষতির বহর বেড়েছে পাহাড় এবং ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পে। পরিস্থিতি যতটা তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হোক না কেন, খুব তাড়াতাড়ি কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না উত্তরবঙ্গের চার জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দৈনিক ১৫ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে ওই জেলাগুলির পর্যটনশিল্পে। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমকে ধরলে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা। পর্যটন ব্যবসার মেরুদন্ডে চিড় ধরে যাওয়ার ফলে কাজ হারানোর ভয়ে দিন গুণতে শুরু করেছে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ যার সরাসরি প্রভাব পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত আরো লাখখানেক বাসিন্দার ওপর। ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটন সংস্থা হিমালয়ান হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের মতে, চা শিল্পের জন্য যেমন পৃথক বোর্ড রয়েছে, ঠিক সেইভাবে পর্যটন শিল্পের জন্য রাজ্যে পৃথক বোর্ড তৈরি করে পর্যটন শিল্পকে সংগঠিত শিল্পের

আওতায় আনা হোক। আধুনিক বিশ্বের সবথেকে বড় শিল্প পর্যটন শিল্প প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। কারণ করোনা যুদ্ধে মানুষ জয়ী হলেও পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ভ্রমণের উপরে কড়াকড়ি করবেই। ফলে পর্যটন শিল্পের উপরে যে সরাসরি প্রভাব পড়বে তাতে কোনও সংশয় নেই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের

গত বছর ডিসেম্বর মাস থেকেই করোনার আতঙ্কে বিদেশি পর্যটকদের বুকিং বাতিলের হিড়িক শুরু হওয়ায় মাথায় হাত পড়ে যায় উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এরপরে এই দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি গুরুতর হয়। বেসরকারি পর্যটন সংস্থার তথ্য অনুসারে ওই চার জেলার রিসর্ট, হোটেল, এবং হোম স্টে মিলিয়ে পর্যটকদের জন্য প্রায় ৪৫ হাজার মাথা গোঁজার ঠাঁই রয়েছে। মালিকপক্ষকে বাদ দিলেও ওই পর্যটন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত প্রায় ২৬ হাজার কর্মচারী। লকডাউনের বাজারে ওই কর্মী এবং কর্মচারীদের মাস মাইনে দিতে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এর বাইরে রয়ে গেছে রিসর্ট, হোটেল এবং হোম স্টেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, বিদ্যুৎ বিল, ব্যাংক ঋণের ইএমআই, জিএসটি ইত্যাদি। ফলে লকডাউন যতই বাড়ছে ততই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। গত দুই বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সারা বছরে কমপক্ষে সাড়ে সাত লক্ষ দেশি এবং ৪০ হাজার বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে যা হালে শূন্যে এসে ঠেকেছে। আগামী আট মাসের আগাম বুকিং বাতিলের হার প্রায় ৯০ শতাংশের ওপরে পৌঁছে গেছে। ভবিষ্যতে যে তা ১০০ শতাংশে পৌঁছে যাবে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

ছোটখাটো পর্যটন ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই হাল ছেড়ে দিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ ব্যবসাতে

লগ্নি করতে গিয়ে তাদের ঋণ নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও পথ ছিল না। আয়ের উৎস আচমকাই বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ঋণের পাহাড় জমতে শুরু করেছে তাদের মাথায়। তার মধ্যে বর্ষার মরসুম শুরু হবার ফলে জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে সমস্ত সংরক্ষিত অরণ্য। তার মধ্যে পুজোর মরসুম তো দূরের কথা, আগামী শীতের মরশুমেও সাধারণ পর্যটকের মাথা থেকে করোনার ভূত সরবে কিনা তা নিয়ে সন্দীহান পর্যটন ব্যবসায়ীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন ওই চার জেলার মুখ্য পর্যটন সংস্থার কর্তারা। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের পর্যটনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেও রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই ভরসা রেখেছেন।

বর্ষার পাহাড় প্রস্তুত নয় এখনও

আগামী শারদোৎসব এবং বড়দিনের ছুটির মরসুমে পাহাড় স্বাভাবিক হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যেই। পাহাড়ের পর্যটন মানে এখন কিন্তু বড় বড় লজ বা হোটেল শুধু নয়, প্রচুর হোম স্টে তৈরি হচ্ছে দার্জিলিং, কার্শিয়ং, মিরিক এবং কালিম্পঙে। ভরা মরসুমে পর্যটন ব্যবসা যে

ধাক্কা দিয়েছে তাতে পাহাড়ের হোম স্টেগুলির অনেকগুলি ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। কালিম্পং-এর থিবোর মিলন ভট্টরাই পরিষ্কার জানালেন, সমস্ত কর্মীদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে তাদেরকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। এই বছর তিনি লজ খোলার মত পরিস্থিতিতে নেই। জমিতে তিনি আগের মতোই চাষের কাজ শুরু করেছেন। কালিম্পং-এর হিলটপ ভিলেজের প্রণিতা ভুটিয়ারাও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কী করবেন। তারা নিশ্চিত এ বছর পর্যটক পাবেন না। তবে আপার সোরেং এর গিরি লজের মহেন্দ্র গিরি জানিয়েছেন তাঁর লজে পর্যটক আসবেনই। এখনই বেশ কয়েকজন পুজোর সময়ে আসার পরিকল্পনা জানিয়েছেন। ইচ্ছেগাঁও এর খাওয়াস এবং মুখিয়া হোম স্টের কর্ণধারেরাও জানালেন তাদের হোম স্টে অক্টোবরের আগে বুকিং হবে না। রিকিসুমের রোজেন রাই বলেন, কোন বাধাই বাঙ্গালীদের ভ্রমণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সংকট কেটে যাবে। সিলারিগাঁও এর পেম্বা তামাং, রাজেন থাপা, কাজী তামাংরা করোনা নিয়ে ভাবতে নারাজ। তবে পর্যটক আসবে কিনা তা নিয়ে তারা খুবই চিন্তিত। যদিও মাথা ঘামাতে নারাজ। তাদের মতে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাবস্থা নেবেন তারা।

পর্যটক আসতে শুরু করেছে ডুয়ার্সে!

তবে বাঙালিকে করোনা সংক্রমণের ভয় দেখিয়ে লাভ যে হয় না তার প্রমাণও মিলেছে। দীর্ঘ লকডাউনের পর জঙ্গল খুলতেই জলদাপাড়া এবং চিলাপাতায় হাজির পর্যটকেরা। যেহেতু রাজ্য সরকার আট জুন থেকে লজ, হোটেল এবং রিসর্ট খোলার অনুমতি দিয়েছে তাই জলদাপাড়াতে জলদাপাড়া জঙ্গল লজ এবং চিলাপাতাতে অর্কিড হোম স্টেতে এসে পৌঁছালেন পর্যটকেরা। আশার আলো জ্বেলে দিলেন সমগ্র ডুয়ার্সের পর্যটনে। সেই অর্থে দীর্ঘদিন পর ডুয়ার্সের জঙ্গলে পর্যটক আসা শুরু হল। লকডাউনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ডুয়ার্সের পর্যটন মহলে তাই খুশির হাওয়া। মাদারিহাটের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এই রিসর্টে এসে পর্যটকেরা ঘুরে বেড়ালেন জঙ্গলমহলে।

এখন ডুয়ার্সের পক্ষ থেকে টেলিফোনে জানতে চাইলাম পর্যটকদের অনুভূতি। জবাবে পর্যটকদের প্রতিনিধি দেবরাজবাবু জানালেন লকডাউনের জন্য চারিদিকে যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তাতে আর ভালো লাগছিল না বলে মুক্তি পেতে ডুয়ার্সে ছুটে এসেছিলেন তাঁরা। রাস্তায় তাঁদের থার্মাল স্ক্রীনিং হয়েছে। সকলে সহযোগিতা করেছেন। রিসর্টের আতিথেয়তাতেও কোনো ঘাটতি নেই। অনেকদিন পর ভালো করে শ্বাস নেওয়া গেছে। দেবরাজবাবুর পুত্রবধূ সুমনাদেবীর মতে, তাঁরা তো কেউ করোনা আক্রান্ত নন, সকলেই সুস্থ আছেন। তাহলে তাদেরকে বাড়ির চার দেওয়ালে আটকে থাকতে হবে কেন। করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সব ধরনের সুরক্ষা এবং সাবধানতা নিয়ে যদি পর্যটকরা আসেন তাহলে তো কোনও ক্ষতি নেই। জলদাপাড়ার জঙ্গল লাগোয়া ওই রিসর্টের আতিথেয়তা এবং করোনার বিরুদ্ধে যাবতীয় স্যানিটাইজিং ব্যবস্থায় খুশি পর্যটকেরা। গুগল সার্চ করে এই স্যানিটাইজিং ব্যবস্থা থেকে ভাল লেগেছিল তাঁদের। তারপরেই অনলাইনে তাঁরা রুম বুক করেন। বেসরকারি ওই রিসর্টে প্রবেশ করার আগে পর্যটকদের থার্মাল স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। করোনার আবহে খাবার নিয়ে যাতে বাইরের পর্যটকদের মনে কোনরকম ভয়ভীতি তৈরি না হয় এবং দ্বিধা না থাকে তার জন্য রিসর্টে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটকেরা আসার পরে মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীরা লকডাউন-এর পরে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছেন।

ডুয়ার্স জুড়ে প্রস্তুতি চলছে সংক্রমণমুক্ত পর্যটন পরিষেবার

চিলাপাতার বনাঞ্চলে চিলাপাতা, কোদালবস্তি এবং মেন্দাবাড়ি মিলে হোম স্টে আছে তেত্রিশটি এবং লজ আছে ছয়টি। শালকুমারে হোম স্টে এবং লজ

মিলে পাঁচটা। জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সংলগ্ন প্রায় পঞ্চাশটির মত। এছাড়াও রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, বক্সা, হাতিপোতা, কুমারগ্রাম, কালচিনি, রায়মাটাং সহ আরও অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে বেশ কিছু লজ এবং রিসর্ট। গত তিন মাস লকডাউন সময়সীমা কাটার পরে আটই জুন থেকে পর্যটন শিল্পে কাজ শুরু করার সরকারি নির্দেশনামা ঘোষিত হবার ফলে ১৫ ই জুন থেকে ১৫ ই জুলাই পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে স্যানিটাইজেশন সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির। সমস্ত লজ, হোম স্টের মালিক এবং কর্মচারী, জিপসি গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার, গাইড, সরবরাহকারী অর্থাৎ এককথায় পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এই সচেতনতা শিবিরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন কী ধরনের ওষুধ দিতে হবে, কীভাবে দিতে হবে, অতিথি এলে তাদেরকে কীভাবে স্যানিটাইজ করতে হবে, ড্রাইভারের সুরক্ষা, কীভাবে গাড়ির দরজা হ্যান্ডেল, সিট, হোটেলের রুম স্যানিটাইজ করতে হবে তার নিয়ম কানুন। ১৫ই জুন থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত এই স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া শেষ করে আগস্ট মাস থেকে হোম স্টে পুরোপুরি চালু করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন।

সরকারি সহযোগিতা নয় কেন? উঠছে প্রশ্ন

চিলাপাতার হোম স্টে গুলোর অন্যতম সংগঠক এবং আলিপুরদুয়ার ডিসট্রিক্ট ট্যুরিজম এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা দুঃখ করে জানালেন, তাদের ছোট ছোট হোম স্টে গুলোর মালিকদের অধিকাংশেরই লজ চালানোর মতো প্রাথমিক অর্থটুকুও নেই। কোনওরকমে কর্মচারীদের প্রথম মাসের বেতন দিয়েছে এবং পরের দুই মাস অর্ধেক করে দিয়েছে। তাই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে হোমস্টের মালিকদের। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

লজগুলোতে অনেক স্থায়ী কর্মচারী আছে। অস্থায়ী কর্মীদের অনেককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। মাংস, মাছ, সবজি, গালামাল ব্যবসায়ীরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত। হোম স্টে এবং লজগুলো চিলাপাতার বনাঞ্চলে হবার ফলে অনেকেই এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাদের পরিবারের কর্মসংস্থান কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। জিপসি গাড়ি নিয়ে যারা জঙ্গল সাফারিতে যেত তাদের কমার্শিয়াল ট্যাক্স, ইন্সুরেন্স, গাড়ির মাসিক কিস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। মোরেটরিয়ামের সুবিধা নিলেও একগাদা সুদ গুনতে হবে ব্যাংকে। জঙ্গল ন মাস খোলা থাকে, তিন মাস বন্ধ । লকডাউন পড়েছিল ট্যুরিজমের পিক সিজনে। বর্ষাতেও কিছু কিছু পর্যটকেরা জঙ্গলে আসতেন। এবার সেটাও বন্ধ। তাই সরকারের সহযোগিতা ভীষণ জরুরি ছিল। অথচ কোনও কার্যকর প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না পর্যটনমন্ত্রী, যিনি কার্যত উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। পাঁচটা সরকারি লজের মধ্যে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া টিলাবাড়ি খোলা হলেও বেসরকারি লজের ব্যাপারে কোনওরকম চিন্তাভাবনা নেই দেখে সরকারের ওপর কার্যত ভরসাই হারিয়ে ফেলেছে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গান্ধী ১৫০। খোলা মনে

সুভাষের কংগ্রেসত্যাগের পেছনে গান্ধীর চক্রান্ত কতটা সত্যি?

সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই বছর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। ১৯০১ সালে। দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে নেতা, সাংবাদিক, অতিথি-অভ্যাগতরা এসেছেন। কলকাতায় যেখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, তা অত্যন্ত নোংরা, দুর্গন্ধে ভরা। অপরিষ্কার শৌচালয় থেকে বাজে গন্ধ আসছে। উপস্থিত অতিথিরা স্বেচ্ছাসেবকদের জায়গাটা পরিষ্কারের জন্য বারবার অনুরোধ করলে,তাঁরা মোটেও আমল দিচ্ছেন না বিষয়টা। একজন স্বেচ্ছাসেবক আরএকজনকে দেখিয়ে দিচ্ছে, সে আবার অন্যজনকে। সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সমাধান না হওয়ার যে 'মহান ঐতিহ্য' আজও আমাদের জাতীয় জীবনে বহমান, সেই ধরণের আর কী!

ময়লা-দুর্গন্ধের সেই সংকটকালে, সেদিন আগত অতিথিদের মধ্যে থেকেই একজন, ঝাঁটা, বালতি হাতে নিয়ে লেগে পড়লেন নর্দমা আর শৌচালয় পরিষ্কার করতে। কে জানত পরবর্তী চার দশকে, এই দেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবনের তিনিই হয়ে উঠবেন মুখ্য কেন্দ্রীয় চরিত্র! তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৯০৫ সালেই প্রথমবার কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর যোগ দেওয়া। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে চলা সাদা চামড়ার শাসকদের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে, তিনি বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করে ফেলেছেন। অথচ এরাজ্যে তাঁর কর্মকাণ্ডের সূচনালগ্নে তাঁকে পাওয়া গেল নর্দমার পাশে, শৌচাগারের ভেতর। মল-মূত্র ঘেঁটে, সাফাই কর্মে।

গান্ধী, মানুষ হিসেবে যে একেবারে ব্যতিক্রমী ছিলেন সেকথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনও একমাত্রিক সরল ধারণা গান্ধী সম্পর্কে করে বসে থাকলে তাঁকে বুঝতে সমস্যা হবে। আবার, একটা চলচ্চিত্র বা উপন্যাস কিম্বা প্রবন্ধে এই বহুমাত্রিক, বর্ণময় চরিত্রের সবটা ধরতে পারা, বুঝতে পারা কঠিন শুধু নয়, অসম্ভব! তাই দরকার, তাঁকে নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও বিশ্লেষণ। কারণ, তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্তের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো, সেই সময়কার জনজীবনের সংকট ও সংঘাতগুলোও, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

গান্ধী চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল গান্ধী সম্পর্কে ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালিদের মনোভাব, অনেকটা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা রফি-কিশোর কিম্বা গাভাস্কার-কপিলদেব অনুরাগীদের মত, নানা শিবিরে বিভাজিত হয়ে আছে। হয় গান্ধী খুব বন্দিত, নয়ত তীব্রভাবে ভর্ৎসনার পাত্র। মহাত্মা নয়ত দুরাত্মা। সত্যিকারের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা, আবেগপ্রধান না হয়ে যুক্তিনির্ভর গান্ধী চর্চা হয় নি যে তা নয়, তবে সংখ্যায় কম। দেশভাগ হওয়ার পর থেকে,

বাঙালির জীবনে, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালির জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, যার উত্ত রাধিকার বহন করে চলেছে এখনকার প্রজন্মেরও অনেকে, সেই সংকটের জন্য বাঙালি প্রধানত দায়ী করে এসেছে গান্ধীকেই।

বাঙালির গান্ধীজির প্রতি ক্ষোভ-অভিমানের উদ্ভব আসলে তাঁর প্রতি গভীর নির্ভরতা ও ভালোবাসার থেকেই সম্ভবত। জানি, এই মন্তব্য অনেকে গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু এই মন্তব্য কী কারণে সেই বৃত্তান্তে প্রবেশের আগে, বাঙালিদের গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রধান ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করে, আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করা যেতে পারে। ক্ষোভের অন্যতম বড় কারণ, নেতাজীর কংগ্রেস ত্যাগ, দেশভাগ হয়ে যাওয়া, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবনে 'বিচিত্র' পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষ করে যৌনতা নিয়ে তাঁর নিরীক্ষাগুলি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুভাষ চন্দ্র বসু বাংলা ও বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক! তাঁর আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। বাঙালির বিপ্লব ও স্বপ্নের প্রতীক, নেতাজী। সেই নেতাজীর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার পেছনে আজও অনেকে গান্ধীজির চক্রান্ত দেখতে পান। কিন্তু সেই ধারণার পেছনে ঐতিহাসিক সত্য কতটা?

হিসেব করলে দেখা যাবে, সুভাষ চন্দ্রের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ও পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসা, এই দুই-এর মাঝখানে সময় প্রায় দু'দশকের মত। এই পুরো সময়কালের মধ্যে, চিন্তায়, দর্শনে, কর্মসূচিতে কংগ্রেস কিন্তু কোনওদিনই একমাত্রিক ছিল না, ছিল নানা ভাবনাচিন্তার সমাহার, একটা সাধারণ প্ল্যাটফর্ম। ভারতীয় জনজীবনের নানা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সমাহারের মতই। এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিলেন বা বলা ভালো যাঁকে ঘিরে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আবর্তিত হচ্ছিল তিনি গান্ধীজী। সুভাষ যখন সম্ভাবনাময় তরুণ তুর্কি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন এবং যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, দু'টো পর্বেই কংগ্রেসের সূর্য কিন্তু গান্ধীজী। আমরা অমিতাভ-মিঠুন শিবির বিভাজনের মত যদি সুভাষ বসুকে নেতা হিসেবে গান্ধীর প্রতিস্পর্ধী কল্পনা করে নিয়ে, গান্ধী-সুভাষ দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়ে, লড়াই শুরু করে দিই, তাহলে বিরাট ভুল হবে।

এখন বিভিন্ন মতামত বা আদর্শকে ও ভিন্নধারার মানুষদের এক জায়গায় নিয়ে এসে পথ চলতে হলে, যিনি চালকের আসনে থাকবেন বা নেতৃত্ব দেবেন তাকে অনেক সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়, সংঘাতের সামাল দিতে হয়। গান্ধীকেও তাই করতে হয়েছে। কংগ্রেসের রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের প্রবেশ ও পরিণত হয়ে ওঠা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের হাত ধরে বা বলা ভালো তাঁর প্রধান সেনাপতি হয়ে। মনে রাখতে হবে কুড়ির দশকের গোড়ার দিকে, চিত্তরঞ্জন ছিলেন গান্ধীর নীতির ও কর্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচক এবং সুভাষ তাঁর মেন্টর দেশবন্ধুরই অনুগামী। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে সুভাষচন্দ্র নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাবলেই উঠে এসেছিলেন দলের শীর্ষ নেতাদের তালিকায়।

এই পথে গান্ধী কোনদিনও কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিলেন এমন দৃষ্টান্ত কি কোথাও ইতিহাসে পাওয়া গেছে? ইচ্ছে করলে তখনকার রাজনীতির সর্বময় কর্তা কি তা পারতেন না? বরং উল্টোটাই সত্যি, দেখা গেছে বারেবারে দলের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বকে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ চন্দ্র বসুকে। সুভাষ, জওহরলালকে সামনে রেখে, কংগ্রেসের মধ্যেই গড়ে উঠছিল একটা বামপন্থী ভাবধারার যুব শাখা। শত মতবিরোধ সত্ত্বেও, গান্ধী কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে উদ্যোগ নেন নি, চাইলে সেটা কি খুব কঠিন কাজ ছিল? উল্টোদিক থেকে নীতিগত ভাবে বিরোধ থাকলেও নেতাজী ও তাঁর পরিবারের গান্ধীজির প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় দেখা যাচ্ছে, সুভাষ ও জওহরলাল চাইছেন সম্পূর্ণ স্বরাজের দাবির স্বপক্ষে প্রস্তাব পাশ করাতে,

অন্যদিকে গান্ধী চাইছেন আরও কিছুটা সময় 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' চালিয়ে যেতে, এবং তা অবলুপ্তির জন্য ইংরেজদের আরও দু'বছর সময় দিয়ে, সংঘাতের পথ এড়িয়ে, আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ার রাস্তা খোলা রাখতে। কিন্তু দু'বছরের বদলে জওহরলালরা দু'মিনিট সময় দিতে রাজি ছিলেন না, পারলে সেদিনই ইংরেজদের তাড়িয়ে দেন আর কী! প্রাজ্ঞ গান্ধী কিন্তু বুঝেছিলেন রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ক্ষমতাচ্যুত করা একটা অলীক কল্পনা মাত্র। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে আগে দেশের মানুষকে তার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। তবে, নিজের অবস্থানে সবটা অনড় না থেকে, তরুণদের আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে ঠিক হল একবছর সময় ইংরেজদের দেওয়া হবে, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯ পর্যন্ত।

নেতাজী এই প্রস্তাবে সংশোধনী আনলেন, সমর্থন করলেন জওহরলাল। সেই সময় কংগ্রেসে নেতাজীদের অনেক সমর্থক ছিল, ভোটাভুটি হল। নেতাজীর নিয়ে আসা সংশোধন প্রস্তাবের স্বপক্ষে পড়ল ৯৭৩ ভোট, বিপক্ষে ১৩৫০ ভোট। নেতাজীর সংশোধনী গৃহীত হল না। এই সংশোধন প্রস্তাব স্তম্ভিত করে দিয়েছিল গান্ধীজিকেও। অথচ, দেখা যাচ্ছে এরপরেও দশবছরের বেশি সময় নেতাজী কংগ্রেসেই থাকছেন, সভাপতিও হচ্ছেন, গান্ধীজীর নেতৃত্বের সমালোচনাও করছেন। কীভাবে সেটা সম্ভব হল, যদি গান্ধী গণতান্ত্রিক না হতেন, যদি ভিন্ন মতের অমর্যাদাই করতেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা ও কর্মীরা তো তখন ছিলেন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসারী!

পরের বছর ১৯২৯ এর কংগ্রেসের অধিবেশন, লাহোর কংগ্রেস। পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হল। এর ঠিক আটদিন আগে দিল্লিতে আলোচনার জন্য এদেশের নেতাদের আমন্ত্রণ করেন লর্ড আরউইন। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যান জিন্না, কংগ্রেসের পক্ষে মতিলাল নেহরু ও গান্ধী। ভারতের ডোমিনিয়ন স্টেটাস পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার রূপরেখা নিয়ে প্রাথমিক বৈঠক, পরবর্তী বৈঠক হবে লণ্ডনে, তার প্রস্তুতি। আলোচনায় আসার পথে, কিছুক্ষণ আগে ভাইসরয়ের বিশেষ ট্রেনের নীচে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ভাইসরয় অক্ষতই থাকেন। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়ে, ভাইসরয় আলোচনা শুরু করে বলেন, "How shall we start?", উত্তরে গান্ধী বলেন, "will the London conference proceed on the dominion status?" তখন আরউইন তাঁর উত্তরে বলেন, "he could offer no such assurance" এরপরে নেতৃবৃন্দ বিদায় নেন।

আটদিন পরে লাহোরে, পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধী, তাঁর আজীবনের চর্চা অহিংস নীতির বশবর্তী থেকে, জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে আরউইনকে অভিনন্দন জানানো যায় কিনা জানতে চাইলেন এবং সুভাষ বসু যথারীতি তার বিরোধিতা করলেন। ভোটাভুটি হল, আবার। এইবার, খুব সামান্য ভোটে সুভাষ বসুর পরাজয় হল। ক্রুদ্ধ সুভাষ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মতো অন্যান্য বিক্ষুব্ধদের নিয়ে, কংগ্রেসের মধ্যেই আলাদা করে 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' তৈরি করলেন। মনে রাখতে হবে, তারপরেও কিন্তু দশবছর কংগ্রেস দলেই ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসেই।

সর্ব ধর্ম সমণ্বয়, চরখা সহ গান্ধীজির আন্দোলনের নানা মৌলিক পদ্ধতি বা নীতি নিয়ে বিরোধ না থাকলেও তাঁর অহিংসা নীতি গ্রহণযোগ্য হচ্ছিল না সুভাষবাবুর মত বিপ্লবী সত্ত্বাসম্পন্ন পরের প্রজন্মের নেতৃত্বের কাছে। ওদিকে অহিংসা নীতি শুধু গান্ধীজির গভীর বিশ্বাসের ফসলই নয়, সেইসঙ্গে পরাধীন, বিত্তহীন দুর্বল দেশবাসীকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ার কৌশলও বটে। তিনি জানতেন, বা তাঁর বাস্তববোধ তাঁকে শিখিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের রোমান্টিক পথে না গিয়ে, সামরিক শক্তি সম্পন্ন ইংরেজের বিরুদ্ধে, অহিংসাকেই হাতিয়ার করতে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

সেসময় এপার বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা
ওপারে জন্ম নিল স্বাধীন বাংলা

রাজনগরের রাজনীতি

(৪)

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি সাল, গোটা দেশে ঘটে গেল অনেকগুলো স্মরণীয় ঘটনা। চৌষট্টি সালের কথা। আমরা তখন ক্লাস এইটে পড়ি। স্টাফ রুমে একটা বড় রেডিও ছিল। মাষ্টারমশাইরা খবর শুনতেন। একদিন দুপুরে জ্যোতির্ময় বাবু গম্ভীর স্বরে আমাদের ক্লাসে এসে খবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু মারা গেছেন। আমরা শোকস্তব্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেল। দিনটা ছিল ২৭ মে। ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হলেন গুলজারি লাল নন্দা। তার কয়েক দিন পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। সে বছরই ৭ নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হল। এই বিভাজনের ঢেউ আবশ্যিকভাবেই এসে পৌঁছাল রাজনগরে। ছোটবেলা থেকে যাদের বিদ্রোহী বলে চিনতাম রাতারাতি তাঁদের হাঁড়ি পৃথক হয়ে গেল। দেবী নিয়োগী, জীবন দে প্রমুখ থেকে গেলেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে (সি পি আই)। আর বীরেন (রবি) দে সরকার, শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, দীনেশ ডাকুয়া প্রমুখ নেতারা নবগঠিত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের নীতি ও কর্মসূচিগুলোর সমর্থক হওয়ার কারণে সিপিআই থেকে বেশির ভাগ বামপন্থী একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

তখন থেকেই এ জেলায় কংগ্রেসের পাশাপাশি একটু একটু করে ফরওয়ার্ড ব্লকের মূল বাম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে শুরু করে নব গঠিত মার্কবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কাশ্মীরে উগ্রপন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারত আক্রমণ করলে ভারত তার জবাব দেয়। শুরু হয় পাক-ভারত প্রচণ্ড যুদ্ধ। আবার শহরে শুরু হয়ে যায় ব্ল্যাক-আউট। তখনও বাংলাদেশের জন্ম হয় নি। আমাদের পাশেই পূর্ব পাকিস্তান। হেমেনবাবু আমাদের ক্লাসে এসে মহড়া দিতেন যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজলে কী করতে হবে। কেমন করে কোথায় লুকাতে হবে, এই সব আর কী! তিনি সে সময় বাসে দিনহাটা থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। একদিন তিনি এসে বললেন, তিনি নাকি এক পাক গুপ্তচরকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। একই বাসে যাত্রী ছিলেন তাঁরা। লোকটির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়াতে তিনি বাসষ্টান্ডে নেমে ওই লোকটিকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন! প্রমাণের অপেক্ষা না করে, মাষ্টারমশাইয়ের এই দেশাত্মবোধে আমরা আপ্লুত হয়ে উঠেছিলাম।

সন্ধের পর থেকেই শহর শুনসান হয়ে যেত। ওই নিষ্প্রদীপ শহরেও প্রতি সন্ধ্যায় সুনীতি রোডে হরিশ পালের রেডিয়োর দোকানে যুদ্ধের খবর শুনতে ভিড় জমাতেন উদ্বিগ্ন মানুষজন। সারাদিন হাসিমারা বায়ু সেনা ঘাঁটি থেকে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের মহড়ায় শান্তি প্রিয় নাগরিকদের উৎকণ্ঠা আর বাড়িয়ে তুলত। তবে পূর্ব পাকিস্তানে এই যুদ্ধের প্রভাব তেমন একটা পড়ে নি। যুদ্ধটাও বেশিদিন চলে নি। তবে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবোধ পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের কাজে লেগেছিল।

১৯৬২ তে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর বামপন্থীদের মধ্যে প্রবল আত্মসন্তুষ্টি কাজ করেছিল। এ জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লক আর কমিউনিষ্টরা কেউ কাউকে সূচাগ্র মেদিনীও ছাড়তে রাজি ছিল না। এমন কি ১৯৬৪-তে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হবার পরও নয়। অথচ চীনের যুদ্ধের পর এমনিতেই কমিউনিষ্টরা কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায়। তারপর বামপন্থী ভোট ভাগাভাগিতে কংগ্রেসের পালে আবার বাতাস লাগে। ১৯৬৬ তে মারা যান প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এর মাত্র ১৩ দিন পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৬৭-র নির্বাচনে বামপন্থীরা এ জেলায় আবার পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। মোট ৮টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে তাঁরা পরাজিত হয়। সেবার শুধু দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের কমল গুহ, মেখলিগঞ্জে অমর রায়প্রধান আর মাথাভাঙ্গায় সিপিএম এর দীনেশ ডাকুয়া ছাড়া বাকি পাঁচটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ রায়, প্রসেঞ্জিত বর্মন, মতিরঞ্জন তর, মহ. ফজলে হক ও শঙ্কর সেন ঈশোর জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন। তবে লোকসভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের দলিত নেতা বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরী জয়লাভ করেন। শ্রী দাসচৌধুরী কিছুদিন পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। গোটা বাংলায় কিন্তু কংগ্রেস বিরোধীরা বিজয়ী হন। শুধু কোচবিহারই ছিল ব্যতিক্রম। সে সময় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিল জোড়া বলদ। কংগ্রেস বিরোধীরা সে সময় রসিকতা করে কোচবিহারের নাম দিয়েছিল বলদবিহার!

সেবার বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে রাজ্যে প্রথম কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। এ জেলার পাঁচ কংগ্রেস বিধায়ক বিরোধী আসনে বসলেন। মাত্র এক বছর পাঁচ মাসের মাথায় সে মন্ত্রীসভা ভেঙে গেল। প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত হল প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সরকার। মাত্র তিন মাসের মাথায় সে মন্ত্রীসভাও ভেঙে গেল। রাজ্যে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। অনেক ডামাডোলের পর রাজ্যে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে আবার কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেই মন্ত্রীসভায় কোচবিহারের কংগ্রেস নেতা সন্তোষ রায় পূর্তমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। মাত্র ৮৭ দিনের মাথায় সে মন্ত্রীসভাও ভেঙে যায়। আবার রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

১৯৬২ তে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর বামপন্থীদের মধ্যে প্রবল আত্মসন্তুষ্টি কাজ করেছিল। এ জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লক আর কমিউনিষ্টরা কেউ কাউকে সূচাগ্র মেদিনীও ছাড়তে রাজি ছিল না। এমন কি ১৯৬৪-তে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হবার পরও নয়। অথচ চীনের যুদ্ধের পর এমনিতেই কমিউনিষ্টরা কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায়।

এদিকে ১৯৬৭-৬৮ সালের পর থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাথে কোচবিহারেও নকশাল আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে যায়। বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে দিয়েই এখানে শুরু হয়ে যায় নকশালবাড়ি আন্দোলন। বলা বাহুল্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এর কেন্দ্রভূমি। চারু মজুমদার কানু সান্যাল আর জঙ্গল সাঁওতালদের নাম তখন দেয়ালে দেয়ালে। মাওসেতুং এর টুপি পড়া একটা স্কেচ লাল কালিতে এঁকে নিচে লেখা হলো "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান", "চীনের পথই আমাদের পথ", "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস" ইত্যাদি নানা স্লোগান। আমি তখন স্কুলে ক্লাস টেনে। কিছুটা যৌবনের উন্মাদনা, কিছুটা হিরোইজম আর কিছুটা দুনিয়া বদলে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবও জড়িয়ে পড়ল এই আন্দোলনে। শহরের আরও যুবকের মত, বিশ্বনাথ বণিক, মৃগাঙ্ক দাশ আর তপন (কানু) মুখার্জিরা সামিল হয়ে গেল আন্দোলনে। ঊনসত্তরের পর ওরাও আন্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেল। আটষট্টি-ঊনসত্তরে নকশাল আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা রাজ্য। রাজ্যে তখন ভাঙাচোরা নড়বড়ে সরকার। শুরু হল জোতদার আর পুলিশ খতম অভিযান। সে সময় পুলিশের নীচু তলার কর্মীদের উদ্দেশে নকশালদের একটা ভীষণ প্রচলিত স্লোগান ছিল— "পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশ বারো"। গোটা জেলা জুড়ে নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬৯-এ কানু সান্যালের উপস্থিতিতে কোচবিহার শহরের ক্ষুদিরাম সরণিতে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের একটি কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত হল সিপিআই (এমএল) দলের একটি সভা। সেই সভায় জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন হৃষিকেশ নাগ। নির্ভীক প্রকৃতির হৃষিকেশ নাগ কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের একজন কর্মচারি ছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে তাঁর চাকরি চলে গেল। বহু বছর মামলা মোকদ্দমা চলার পর তিনি তাঁর চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে স্কুল কলেজের অনেক ছাত্র নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ল। জেনকিন্স স্কুলের কয়েকজন ছাত্র স্বাধীনতা দিবসে স্কুল থেকে জাতীয় পতাকা নামিয়ে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল। খোদ শহরের বুকে সাগরদিঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ভরসন্ধ্যায় খুন হয়ে গেলেন সিআরপিএফ-এর এক কমানডেন্ট। রাজবাড়ির পরিত্যক্ত আস্তাবলে তখন সিআরপিএফ এর একটি ব্যাটালিয়ন থাকত। ওই কমানডেন্ট ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছিলেন সান্ধ্য ভ্রমণে। কমানডেন্ট খুনের এই রোমহর্ষক ঘটনায় গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে গেল। তুফানগঞ্জে সংকোশ নদীর চর নকশালদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হল। সেখানে পুলিশ অভিযান চালালে, ধীরেন দাসের নেতৃত্বে নকশালরা পুলিশের তিনটি রাইফেল ছিনতাই করে তিন পুলিশকে নদীর জলে চুবিয়ে রাখে। পরে প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে পোশাক খুলে পালিয়ে বাঁচে পুলিশ বাহিনী। ট্যারা মাস্টারের নেতৃত্বে দিনহাটার টিয়াদহতে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়। দিনহাটার বুড়িরহাটের দিনেশ মাস্টারও (ঘোষ) ছিলেন এ জেলার অগ্রগণ্য একজন নকশাল নেতা।

সে সময় কোচবিহার শহরে নেট দিয়ে ঘেরা পুলিশের কালো ভ্যান দেখলেই আমরা কালীপদ কালীপদ বলে চেচিয়ে উঠতাম। ধুতিশার্টের সাথে কালো বুট পড়া ইয়া গোঁফওয়ালা মিশিরলাল নামে সাদা পোশাকের এক বিহারী পুলিশ কনস্টেবল সে

ধীরে ধীরে স্কুল কলেজের অনেক ছাত্র নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ল। জেনকিন্স স্কুলের কয়েকজন ছাত্র স্বাধীনতা দিবসে স্কুল থেকে জাতীয় পতাকা নামিয়ে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল।

সময় ছিল শহরের নকশাল যুবকদের ত্রাস। "মোচারু" বললেই ওকে সবাই চিনে যেত। শহরের গুঞ্জবাড়িতে পলিটেকনিক হোস্টেলে লুকিয়ে ছিল বিশ্বনাথ। গোপন খবর পেয়ে ঠিক সময় ভ্যান নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় সাব-ইন্সপেকটর দিবাকর চ্যাটার্জী আর মিশিরলাল। কিন্তু নীচ থেকে ছাত্রদের পুলিশ পুলিশ চিৎকারে তিন তলা থেকে রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নেমে তোর্ষা পেরিয়ে পালিয়ে গেল বিশ্বনাথ। সার্ভিস রিভলবার থেকে দু রাউন্ড ফায়ারও করেছিল মিশির, কিন্তু ফস্কে যায়। সে যাত্রা বেঁচে যায় বিশ্বনাথ। সেই থেকেই বিশ্বনাথ ফেরার হয়ে যায়। এদিকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পূর্ব-পাকিস্তানে পালাতে গিয়ে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর হাতে ধরা পড়ে গেল আমাদের বন্ধু তপন (কানু) মুখার্জী আর তপন ভট্টাচার্য। ওদের পাকিস্তানে ধরা পড়ার খবর তখন কোচবিহারে কেউ জানত না। দিন যায় মাস যায় বছর যায়, ওদের দুজনের কোনও খবর নেই। বাড়ির মানুষ উৎকণ্ঠিত। পাড়া প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবরা কেউ বলতেন এনকাউন্টারে মারা গেছে, আবার কেউ বলতেন কোনও জেলে আটক আছে। ভারতের গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে মাসের পর মাস ধরে প্রচণ্ড নির্যাতন চলতে থাকে ওদের উপর। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রংপুর জেল ভেঙে ভারতীয়সেনা ওদের মুক্ত করে। ওরা বাড়ি ফিরে আসতেই আবার পুলিশ ওদের পেছনে লেগে যায়। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত ওরা কংগ্রেসে যোগ দেয়। এরপর রাজ্যের মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের হস্তক্ষেপে ওদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমাও তুলে নেয় পুলিশ।

এদিকে ১৯৭১ শুরু হয়ে যায় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। এবার কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে নয়। যুদ্ধ শুরু হল পূর্ব প্রান্তে। আসলে এটা ছিল বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ। মার্কিন ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সর্বাত্মকভাবে বাংলাদেশের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ছায়াযুদ্ধটা শুরু হয়ে যায় মার্চ থেকেই। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে পাক বাহিনীর চূড়ান্ত অত্যাচার, গণধর্ষণ আর গণ হত্যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সে দেশ থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে চলে আসতে শুরু করে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হাজার হাজার শরণার্থী শিবির খোলা হয়। কোচবিহার জেলার সব মহকুমায় অনেক গুলো শিবির খোলা হয়। শহরের কাছাকাছি বড়াইবাড়ি, পুণ্ডিবাড়িতে খোলা হল শিবির। শহরের কামেশ্বরী রোডে সুভাষপল্লীতে একটা পরিত্যক্ত বিশাল গুদামে শুরু হয়ে গেল মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। ভারতীয় সেনারা সেখানে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে পাক বাহিনীর সাথে লড়াই করতে সে দেশে ঢুকিয়ে দেয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধা কাদের (বাঘা) সিদ্দিকী সে সময় বেশ কিছুদিন কোচবিহারে ওই শিবিরে ছিলেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সে সময় ত্রাণ কাজ খতিয়ে দেখতে নিজে ছুটে আসেন কোচবিহারে। মন্ত্রী সন্তোষ রায় আর সাংসদ বিনয় কৃষ্ণ দাসচৌধুরীকে নিয়ে তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর অত্যাচার চরমে ওঠে। লক্ষাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে পাক সেনারা। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত। মাত্র ১৩ দিনের মাথায়, ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে পাকবাহিনী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

(ক্রমশ)

আসামের চিঠি

আসামের অর্ধেক মানুষ চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে চলেছে!

সমর দেব

আসামের পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি খুব সহজ নয়। ভেঙে পড়েছে সমগ্র অর্থনীতি। প্রতিদিনই বাড়ছে বেকারত্ব। দৈনন্দিন কাজকর্ম, লেনদেন বন্ধ হয়ে পড়ায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এক চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর, প্রতি বছরের মত মরশুমি বন্যায় চাষের ব্যাপক ক্ষতি এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়াল করে তুলেছে।

সারা দেশের অর্থনীতিই বেশ কিছুদিন ধরেই গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বছরের শুরু থেকেই দেশে আর্থিক বিকাশের হার বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ অথবা শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছিল। সবচেয়ে সর্বনাশ হয়েছে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পোদ্যোগ। তার উপর করোনায় আমাদের দেশেও প্রতিদিনই বাড়ছে রোগ সংক্রমণ এবং প্রাণহানির ঘটনা। ফলে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একরকম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

আর, এই পটভূমিকায় রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায় আসাম সরকার। তাতেই ধরা পড়েছে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের ছবি। রাজ্যে বেকারত্বের হার আগে থেকেই ৮ শতাংশ। সেখানে মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে আবির্ভূত হয়েছে করোনা। রাজ্যের আর্থিক এরকম চলতে থাকলে বেকারত্বের হার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তার মানে এই যে, আসামের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক চরম আর্থিক দুর্দশায় পড়বে। এই সংখ্যাটি কিন্তু প্রচুর। অসমের জনসংখ্যা তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষের কাছাকাছি। তার অর্ধেক মানে দেড় কোটিরও বেশি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার ২০১১-১২ বর্ষের হিসেবে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে জনসংখ্যার ৩২ শতাংশই গরিব। এই রিপোর্টেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ অনেক কম হবে। অনুমান করা হয়েছে, রাজ্যে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ হতে পারে ১২৪২৩ কোটি থেকে ১৮২৩৬ কোটি টাকা।

আসামের সমস্যাটি বহুমুখী এবং জটিল। করোনার জেরে লকডাউন এবং তার প্রেক্ষিতে দেশের নানা প্রান্তে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী ঘরে ফিরেছেন। এদের সংখ্যাটি বারো-তেরো লক্ষের মতো। এরা ঘরে ফিরে আসায় তাদের ওপরে নির্ভরশীল পুরো পরিবার সঙ্কটে পড়েছে। একইসঙ্গে ভিনরাজ্যের অনেক শ্রমিক-কর্মচারী ঘরে ফিরে গেছেন।

কোভিড মহামারির প্রেক্ষিতে অমিয় কুমার দাস ইনস্টিটিউট অব সোসাল চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সহযোগিতায় স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশন আয়োগ (এসআইটিএ) পরিচালিত এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে কোভিডের জেরে ৬৭ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নতুন করে এই এত মানুষের জীবিকা হারানোর পরিণামে রাজ্যে দেড় কোটির বেশি মানুষ সংকটের মুখে পড়তে পারে। সমীক্ষার রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে।

করোনা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার জেরে রাজ্যে নতুন করে ২৭.১ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে যেতে পারে। আর, তার পরিণামে রাজ্যে বেকারত্বের হার নতুন করে বাড়তে পারে ১৬ থেকে ২৭ শতাংশ। এই বিপুল কর্মহীনতায় মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছতে পারে।

হুহু করে বেকারত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, নির্মাণ শিল্প, পর্যটন এবং আতিথেয়তার মতো ক্ষেত্রগুলি। কারণ এসব ক্ষেত্র বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করেছিল। এই ক্ষেত্রগুলি জোর ধাক্কা খাওয়ায় এসবের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক ও কর্মীরা কাজ হারাচ্ছেন। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ১৩.১ লক্ষ, পরিবহণে ১২ লক্ষ, পর্যটন ও আতিথেয়তায় এক লক্ষ এবং নির্মাণ শিল্পের ১.৩ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ইতিমধ্যেই কাজ হারিয়েছেন। ফলে, এই ধসে পড়া অর্থনীতিকে ফের কী করে সচল, সক্রিয় করে তোলা সম্ভব তা নিয়ে সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।

আসামের সমস্যাটি বহুমুখী এবং জটিল। করোনার জেরে লকডাউন এবং তার প্রেক্ষিতে দেশের নানা প্রান্তে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী ঘরে ফিরেছেন। এদের সংখ্যাটি বারো-তেরো লক্ষের মতো। এরা ঘরে ফিরে আসায় তাদের ওপরে নির্ভরশীল পুরো পরিবার সঙ্কটে পড়েছে। একইসঙ্গে ভিনরাজ্যের অনেক শ্রমিক-কর্মচারী ঘরে ফিরে গেছেন। এদের অভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বভাবতই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে, এখনও সবই বন্ধ রয়েছে বলে

একসময় করোনার প্রকোপ প্রশমিত হবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আর, তখন ধরা পড়বে ভিনরাজ্য থেকে আগত শ্রমশক্তির অভাব। রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে জরুরি ভিত্তিতে তার মোকাবিলা করা না হলে অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয় এড়ানো অসম্ভব।

এদের অভাব হয়ত সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একসময় করোনার প্রকোপ প্রশমিত হবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আর, তখন ধরা পড়বে ভিনরাজ্য থেকে আগত শ্রমশক্তির অভাব। রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে জরুরি ভিত্তিতে তার মোকাবিলা করা না হলে অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয় এড়ানো অসম্ভব।

এদিকে, আগে থেকেই নানা কারণে হাজারো সঙ্কেট জেরবার চা শিল্প নতুন করে সঙ্কটে পড়েছে। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে আসামে চা শিল্পের ১৮০ বছরে এমন সঙ্কট আর দেখা যায়নি। মনে রাখা দরকার যে, আসামে চা শিল্পে জড়িত রয়েছেন সব মিলিয়ে ত্রিশ লক্ষের বেশি শ্রমিক। লকডাউনের জেরে চা বাগান ও কারখানা মালিকদের অকল্পনীয় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। আর, শ্রমিকদের অবস্থাও তথৈবচ। চায়ের মরশুম আসলে বর্ষাকাল। এবারে এই মরশুমে চা বাগানগুলি বন্ধ থাকায় কার্যত পুরো এক বছরের উৎপাদন ক্ষতির মুখে। এমনিতেই সাম্প্রতিককালে বিশ্ব বাজারে তুমুল প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে আসামের চা শিল্প। এমনিতেই আসামে চা শিল্পের ১৮০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম তাকে শ্রীলঙ্কা, চীন, কেনিয়ার মতো চা উৎপাদক দেশের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জকে আরও কঠিন করে তুলেছে করোনা-সঙ্কট তথা লকডাউন। ইতিমধ্যেই চা শিল্প থেকে প্রাপ্ত সরকারি রাজস্বের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১,০৫৯ কোটি টাকা। চা শিল্পের ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ সময় মার্চের মাঝামাঝি থেকে। বছরের প্রথম চা পাতা তোলা শুরু হয় মার্চের মাঝামাঝি। ২৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল অবধি লকডাউনের প্রেক্ষিতে টানা সময় জুড়ে চা বাগানগুলি এবং কারখানাগুলি বন্ধ ছিল। পরে, সরকার অর্ধেক কর্মী দিয়ে কারখানা চালুর অনুমতি দেয়। তবে, কিছু কঠোর নিয়মকানুন পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে, আসামের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পাঁচ শতাংশ চা শিল্প। ফলে চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারের পক্ষেও সেটা সরাসরি বড় মাপের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই সঙ্গে চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের পরিবার-পরিজনের জীবনও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে বাধ্য।

এদিকে, রাজধানী গুয়াহাটিতে নতুন করে দুর্ভাবনা বাড়িয়েছে করোনা। গুয়াহাটিতে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বাড়ছে সংক্রমণ। জনসচেতনতার অভাবে লকডাউনের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে অসংখ্য মানুষ। তারই জেরে হুহু করে বাড়ছে সংক্রমণ। বাধ্য হয়েই, ২৮ জুন থেকে ১২ জুলাই অবধি নতুন করে লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে গুয়াহাটি সহ কামরূপ মেট্রো জেলায়। এবারের এই লকডাউনে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সবই বন্ধ থাকছে। সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, লকডাউন ভাঙলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। গ্রেফতার এবং এমনকি কারাবাসও জুটতে পারে। সরকারি এই কঠোরতার পেছনে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কা সক্রিয় রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। সওয়া তিন কোটি জনসংখ্যার রাজ্যে অর্ধেক মানুষ অনাহারের মুখে এসে দাঁড়াত পারে, এই অশনিসঙ্কেতই বোধহয় সতর্ক করে দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। অসংযত, বেয়াড়া তথা উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে যে-কোনওভাবেই হোক না কেন, স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করা না গেলে, গুয়াহাটি এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতে পারে।

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুসুকু গেছিল হস্তিনাপুর বেড়াতে। সে নগরীতে এসেছে পুন্ডরীকাক্ষ। সে চায় কৌরব-পাণ্ডবের বিভেদ সৃষ্টি করতে। দুর্যোধনকে কালকূট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলে টানে। যুবরাজত্বের দাবী তাঁরও যে কম নয়, সেটা বোঝায়। কর্ণও চলে আসেন। ভুসুকু একটি আশ্রমের হস্তিচালকের কাজ নিয়ে সুখেই থাকতে পারত, কিন্তু সে জড়িয়ে গেল ষড়যন্ত্রে। তাঁকে সম্মোহিত করার জন্য পুন্ডরীকাক্ষের গুরু অল্লরাজ অঙ্গার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু ভুসুকু কোনও অজ্ঞাত কারণ সম্মোহিত হলো না। তাঁর মাধ্যমেই যুধিষ্ঠির অনেক কিছু জেনেছিলেন। পাণ্ডবরা ভুসুকুকে উদ্ধারের জন্য বের হলেও ভুসুকুকে বিনা আয়াসেই পেয়ে গেল। এদিকে আবার মহিষাসুর আসছেন হস্তিনাপুরে। তারপর?

৩৪

ব্যাসদেব একটি কৌতূহলোদ্দীপক পুথি পড়তে দিয়েছেন। ভীষ্ম শেষপাতাটি পড়ছিলেন। একটু পরে পাঠ সমাপ্ত হলো। তিনি তৃপ্তমুখে পুথিটি ব্যাসদেবকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল স্বরে বললেন, 'অভূতপূর্ব! এ সব আপনি কোত্থেকে পান বলুন তো?'

'এটা গান্ধার দেশের পুথি। আমি শকুনির আমন্ত্রণে তিন বছর গান্ধারের অতিথি হয়ে ছিলাম। সেখানেই পুথিটি পড়ি এবং নকল করাই।' ব্যাসদেব আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। গ্রন্থাগারের লাগোয়া একটি কক্ষে দুর্যোধন অপেক্ষা করছেন। তিনি একটি বিশেষ বক্তব্য জানাবার জন্য ভীষ্মের কাছে সময় চেয়েছেন। ব্যাসদেব থাকলেও তাঁর আপত্তি নেই। বস্তুতঃ হস্তিনাপুরের জ্ঞানিগুণিদের কাছেই তিনি বক্তব্যটি তুলে ধরতে চান।

'গান্ধার সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে পারি?'

ব্যাসদেবের প্রশ্নটি ঠিক ধরতে পারলেন না ভীষ্ম। 'ও দেশের সাথে তো আমাদের কুটুম্বিতা ব্যাসদেব!' একটু বিস্মিত সুরই শোনা গেল তাঁর গলায়। 'আপনি কী অর্থে প্রশ্নটি করছেন?'

'হস্তিনাপুরের সদামঙ্গলকামী ভীষ্মের চোখে গান্ধারের অবস্থান কী?'

ভীষ্ম বুঝতে পারলেন ব্যাসদেব কী জানতে চাইছেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌন থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'হস্তিনাপুরের উত্থানে গান্ধার কোনওকালেই সুখি হয় নি মুনিশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই মনোভাব কেবল গান্ধারের নয়, আরো অনেক রাজ্যেরই। আপনার নিশ্চই স্মরণ আছে যে ধৃতরাষ্টের সাথে গান্ধারীর বিবাহ কিছুটা বলপূর্বক ঘটেছিল। শকুনির আপত্তি ছিল। কিন্তু হস্তিনাপুরের সাথে কুটুম্বিতায় আবদ্ধ হওয়ার প্রলোভন থেকে গান্ধাররাজ বের হতে পারেন নি। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন।'

তারপর সুর বদলে একটু উৎকন্ঠার সাথে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি গান্ধারের দিক থেকে কোনও বিপদ অনুমান করছেন?'

'লালচুলের লোক আমি প্রথম দেখেছিলাম গান্ধারে।' ব্যাসদেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'গান্ধার থেকে প্রথমে অনেকটা পশ্চিমে তারপর উত্তরে আরো অনেক পথ পেরিয়ে গেলে শীতলদেশের শুরু। সেখানে আকাশ থেকে তুষার বৃষ্টি হয়। আমি সে দেশের কথা প্রথম জানি গান্ধারে গিয়েই। শীতলদেশের সাথে গান্ধারের যোগাযোগ ক্ষীণ হলেও অব্যহত ছিল। সেই সূত্রে লালচুলের লোক খুব অল্প হলেও গান্ধারে দেখা যায়।'

'শীতলদেশের লোকের চুল লাল হয় বলছেন?'

'লাল হয়, সাদাও হয়। পাটকিলে রঙের চুলও দেখা যায় সে দেশে। তবে তেমন চুল হলেই যে শীতলদেশের বাসিন্দা হবে সেটা ভাবাও ঠিক নয়।'

ভীষ্ম কিছু বললেন না। চুপ করে কক্ষের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন। দুর্যোধন অপেক্ষা করে আছে। তাঁকে ডেকে পাঠান উচিত। একজন দাসকে ডেকে তিনি দুর্যোধনের কাছে পাঠালেন। একটু পরেই দীর্ঘদেহী দুর্যোধন প্রবেশ করলেন কক্ষে। প্রদীপের আলো তাঁর শরীরে বাধা পেয়ে দীর্ঘ ছায়া ফেলল কক্ষের মেঝেতে।

'বলো দুর্যোধন। কী মত ব্যক্ত করতে চাও করো। আমি অনুমতি দিচ্ছি। নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচে বলো।'

'আপনাদের প্রণাম।' দুর্যোধন একটি আসনে বসলেন। ব্যাসদেব এবং ভীষ্ম পাশাপাশি দুটি আসনে সোজা হয়ে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। দুর্যোধন মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন। বক্তব্য গুছিয়ে বলা বেশ কঠিন কাজ। দুর্যোধন এসব কাজে মোটেই আগ্রহ পান না। কিন্তু তাঁকেই বলতে হবে।

'ব্যাপারটা আসলে আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।' প্রথম বাক্যটা বলে দুর্যোধন একটু দম নিলেন। 'আমরা আসলে কারা? মানে, আমরা যারা হস্তিনাপুরি তাঁরা আসলে কারা?' আরো দুটো বাক্য উচ্চারণ করে একটু আত্মবিশ্বাস পেলেন তিনি।

উল্টোদিকে বসে থাকা দুই মহা প্রাজ্ঞর দিকে তাকিয়ে তিনি পুনরায় প্রশ্নটি কবলেন— 'আমরা তবে কারা?'

'আমরা যে হস্তিনাপুরি এটাই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?' ভীষ্ম নরম গলায় পাল্টা জিগ্যেস করলেন।

'কিন্তু আমাদের জাতিগত পরিচয় কী?' দুর্যোধন বেশ জোর দিয়ে জানতে চাইলেন। 'অসুররা যেমন অসুর। আমরা কী? অনসুর বললে পুরোটা বলা হয় না।'

'তোমার মুখেই শুনি সেটা।'

'আমরা হলাম আর্য।'

ভীষ্ম বিরক্তি চেপে রেখে অন্যদিকে তাকালেন। ব্যাসদেব মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন মেঝের দিকে তাকিয়ে। কয়েক পলক কেটে গেল। ভীষ্ম শেষে নিজেকে আবার শান্ত করে ধীর ভাবে বলতে শুরু করলেন নিজের বক্তব্য। দুর্যোধন যে কথা বলতে চাইছে সে বিষয়ে তিনি অবহিত। হস্তিনাপুরিরা নিজেদের আর্য বলতে পারে কি না সে বিষয়ে নগরে আলোচনা হয়েই থাকে। কেউ কেউ নিজেদের আর্য বলে পরিচয়ও দেয় বলে জানা গেছে। কিন্তু এ নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজপুরুষের আদৌ কিছু ভাবেন নি। ভাবার বিষয় বলে মনেই করেন নি। কিন্তু দুর্যোধনের মুখে সেই কথা শুনে ভীষ্মের মনে বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া আর কিছু ঘটে নি। দুর্যোধন এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

দুর্যোধন সব শুনে একটুও দমে না গিয়ে বললেন, 'ভূতমিত্রের আশ্রমের পড়ুয়াদের মধ্যেও এই দাবী উঠেছে তাতশ্রী! তাঁরা দ্রুত জনসমর্থনও পাচ্ছে।'

ব্যাসদেব ফট করে জিগ্যেস করলেন, 'আশ্রমিকরা কি এসব প্রচার করছে?'

দুর্যোধন থতমত খেয়ে বললেন, 'কতকটা তাই।'

'তবে তাঁদের বোঝাও যে হস্তিনাপুরিরা নিজেদের কী বলে পরিচয় দেবে তা আদৌ কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে কেউ যদি নিজেদের আর্য বলতে চায় তবে কোনও বাধা নেই —কী বলেন আপনি?'

ভীষ্ম বললেন, 'আমিও এটাই বলি। মোটের ওপর হস্তিনাপুরিরা আর্য কি অনার্য তা অতি তুচ্ছ বিষয়।'

'কী বলছেন তাতশ্রী!' দুর্যোধন একটু রেগে যায়। 'আমাদের একটি জাতিগত পরিচয় হোক তা কি আপনি চান না?'

'দেখো বাছা।' ভীষ্ম এবার উঠলেন। 'জাতিগত পরিচয় চাইলেই তৈরি হয় না। তুমি বলছ আমাদের পরিচয় হবে আর্য। কিন্তু আর্য বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? এমনিতেই এই শব্দটা সাত-আট রকম অর্থ পাওয়া গেছে। কৃষিবিদ্যা অর্জন করলে আর্য উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু সে অর্থে অসুররাও আর্য। এই অবস্থায় হঠাৎ করে আমরা কেন নিজেদের আর্য বলব তা স্পষ্ট হওয়া চাই। এই কুরুবংশের মূল পরিচয় সে মহান রাজা সগরের উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির কারণে হস্তিনাপুর হয়ে উঠতে পেরেছে আমাদের মত আরো আরো রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কুরুবংশ কেন সে পরিচয় ছেড়ে আর্য হবে?'

ভীষ্ম থামলেন। তাঁকে একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। চোখের কোণ লাল হয়ে গেছিল তাঁর। দুর্যোধন কিন্তু বিচলিত হলেন না। শান্তস্বরে বললেন, 'আমরা বলব যে আর্য হলো শ্রেষ্ঠ জাতি।'

'অসুরদের তুলনায় আমরা শ্রেষ্ঠ?' ভীষ্ম হেসে ফেললেন। 'শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়েই তো দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। অসুরদের সঙ্গে সেই দীর্ঘ সংগ্রামে আমরা কেউই জিতি নি দুর্যোধন। সব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা তা বুঝতে পেরে শান্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অসুররাও শান্তি খুঁজছিল। তারপর সন্ধি হলো। শ্রেষ্ঠত্ব বলে কিছু হয় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অনেক রক্তপাত হয়, বহু মানুষ তাঁর প্রিয়জনকে হারায়। এত ক্ষতির পরেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।'

'আমি মানছি কোনও কোনও ব্যাপারে অসুররা

‘অসুরদের তুলনায় আমরা শ্রেষ্ঠ?’ ভীষ্ম হেসে ফেললেন। ‘শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়েই তো দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। অসুরদের সঙ্গে সেই দীর্ঘ সংগ্রামে আমরা কেউই জিতি নি দুর্যোধন। সব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা তা বুঝতে পেরে শান্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অসুররাও শান্তি খুঁজছিল।

এগিয়ে, কোনও কোনও ব্যাপারে আমরা। কিন্তু আমাদের ভাষা যে অসুরদের তুলনায় উৎকৃষ্ট তা নিশ্চই স্বীকার করেন আপনি?’

‘সেটা অসুররাও স্বীকার করে। তাঁরা তো বলেই যে তাঁদের কৃষি বিষয়ক কবিতাগুলি আমাদের ভাষায় অনেক বেশি শ্রুতিমধুর লাগে। বিভিন্ন জাতির অগ্নি উপাসনা থেকে সার সংগ্রহ করে আমরা যে যজ্ঞপদ্ধতি রচনা করেছি, তার প্রশংসা অসুররা প্রায়ই করে থাকে। তাঁরা তো বলেই যে আড়ম্বরের বিচারে এবং সঙ্গীত প্রয়োগের দক্ষতায় যজ্ঞের তুলনীয় কিছু নেই।’

‘আপনার কথার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত তাতশ্রী। এবার ভেবে দেখুন— এই অবস্থায় আমরা যদি আর্যজাতির মহত্ব আমাদের ভাষায় রচনা করে তাকে বেদের অন্তর্ভূক্ত করে নিই তবে তা সত্য হতে বেশি দিন লাগবে না।’

এইবার ব্যাসদেব অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বাকি দু-জন বেশ অবাক হয়ে গেলেন তাঁর এই হাস্যে। তিনি রসিক পুরুষ কিন্তু হঠাৎ কী এমন হাসির ব্যাপার ঘটল? ‘তুমি কি জান দুর্যোধন আমি বেদের শ্লোকগুলি সংগ্রহ এবং শ্রেণিবিন্যাস করার কাজে দীর্ঘদিন রত আছি?’ হাসি থামিয়ে তিনি বললেন। ‘বেদের কোন শ্লোক অসুরদের কবিতার অনুবাদ, কোন শ্লোক আমাদের পূর্বপুরুষদের রচনা, কোন শ্লোক অর্বাচীন— তার বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করছি? এই অবস্থায় আর্যর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে শ্লোক রচনা করে বেদে স্থান দেবে কী ভাবে? এ তো ভারি হাসির কথা বললে তুমি!’

‘হাসির কথা নয়।’ দুর্যোধন শুকনো গলায় বললেন। ‘পুরনো শ্লোকেও আর্য শব্দ আছে। টীকা রচনা করে তার মহত্ত্ব প্রচার করা কি আদৌ অসম্ভব মুণিশ্রেষ্ঠ?’

‘তুমি চাইলে একদিন নিশ্চই তেমন টীকা কেউ রচনা করবে বৎস্য।’ ব্যাসদেব শান্ত স্বরে বললেন। তাঁর চোখের চপলতা চকিতে বদলে গিয়ে ফিরে এসেছে গভীরতায়। সে গভীরতা এতটাই তীক্ষ্ণ যে দুর্যোধন তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। সহসা বাক্যহারা হয়ে তিনি দু-জনের মুখের দিকে আরেকবার করে চাইলেন। তারপর গট গট করে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ ছেড়ে।

‘আপনি কি দুর্যোধনের সঙ্গী বিষয়ে কৌতূহলী হয়েছেন কখনো?’ দুর্যোধনের বেরিয়ে যাওয়ার দিকে এক পলকে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললেন ব্যাসদেব। ভীষ্ম অন্যমনস্ক সুরে কেবল উচ্চারণ করলেন ‘হচ্ছি।’

হঠাৎ একজন বার্তাবাহক ছুটতে ছুটতে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে প্রবেশ করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ‘বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইছি। কিন্তু এইমাত্র জানা গেছে মহিষাসুর হস্তিনাপুরের সীমান্তে অবস্থান করছেন। তিনি হস্তিনাপুরে কিছুদিন থাকতে চান।’

ভীষ্ম আর ব্যাসদেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কে না জানে যে মহিষাসুরের সাহচর্য অতি আনন্দ দেয়। হস্তিনাপুরের বাণিজ্যনীতি নিয়ে আলোচনা করার অতি উত্তম সুযোগও পাওয়া যাবে। ফলে হস্তিনাপুরের সরকারি মহলগুলিতে সাড়া পড়ে গেল। রাজকীয় অতিথি রূপে মহিষাসুরকে কী ভাবে কোথায় রাখা হবে, তা নিয়ে জরুরি বৈঠক বসল। তাঁকে সাদরে নগরে অভ্যর্থনা করার জন্য বিদুরের নেতৃত্বে গঠিত হল একটি দল।

৩৫

গঙ্গাবিহার হলো হস্তিনাপুরের অন্যতম অভিজাত অঞ্চল। শ্রেষ্ঠ পুথি, শ্রেষ্ঠ মণিমাণিক্য, শিল্পকর্ম সমেত হরেক আশ্চর্য এবং মূল্যবান দ্রব্যের দোকানগুলো সব এখানেই। এ ছাড়াও দেশবিদেশের নিপুণ কলাবিদরা এখানে বসবাস করেন। তাঁদের ছোট ছোট আশ্রম রয়েছে। ধনী কলামোদি লোকজন এখানে তাঁদের উদ্যানকুটির নির্মাণ করিয়েছে। সব মিলিয়ে জমাটি ব্যাপার। বহুকাল আগে যখন রাজা সগর বুঝতে পারলেন যে দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গার ধারাকে একটু ঘুরিয়ে নগরী স্থাপনের উপযুক্ত উঁচু ভূখণ্ডের কাছ দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে স্থানটি হয়ে উঠবে আদর্শ। প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া অনেক সহজ হবে। দেবতাদের সাহায্যে তিনি খাল খনন করিয়ে গঙ্গার ধারাকে ঘুরিয়ে এনে আবার মূল ধারায় মিশিয়ে দিতে সফল হন। রাজধানী গঠন করার পর প্রথম রাজপ্রাসাদ তিনি তৈরি করিয়েছিলেন গঙ্গাবিহারে।

ভূতমিত্র গুটি কয়েক শিষ্যকে নিয়ে গঙ্গাবিহারের পুথি সরণীতে রথ থেকে নামলেন। যজ্ঞের কাজে যে সব মুণি আশ্রমের অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁদের সামান্য উপঢৌকন দেওয়া কর্তব্য। পুথি পেলেই তাঁরা সব চাইতে খুশি হন। ভূতমিত্র পুথিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসেছেন। এই কাজ অন্যকে দিয়ে হত না বলে শত ব্যস্ততার ফাঁকে সময় বের করেছেন গঙ্গাবিহারে আসার জন্য। সবাই জানে যে বিচিত্রসূর্যের পুথির দোকানের সংগ্রহের তুলনা নেই। নতুন পুথি বাজারে এলেই তিনি সবার আগে নকল করে বিক্রি শুরু করেন। প্রায় একশত নকলনবীশ তাঁর দোকানের পেছনে বিরাট কক্ষে বসে পুথি নকল করে। হস্তিনাপুরের সেরা নকলনবীশদের প্রায় সকলেই বিচিত্রসূর্যের কর্মচারি।

'স্বাগতম মহাশয়!' বিরাট দোকানের এক কোণা থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন বিচিত্রসূর্য। 'নিশ্চই বিদেশি মুণিদের উপঢৌকন সংগ্রহ করতে আপনার আসা হয়েছে?'

'নতুন পুথি কিছু এসেছে নাকি এরমধ্যে?'

'গতকালই অসামান্য একটি পুথি আমাদের হাতে এসেছে। আসা অবধি গন্ডায় গন্ডায় বিকোচ্ছে মহাশয়! মনে হচ্ছে আমার সমস্ত নকলনবীশদের ওই পুথি নকলের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে।'

'বটে!' ভূতমিত্র আগ্রহ পেলেন। 'এ কি সেই চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ক নতুন পুথি যা সমুদ্রপাড়ের দেশে রচিত হয়েছিল?'

'না না। সে পুথি অনুবাদ না হলে পড়বেন কী ভাবে? অনুবাদক ছাড়া অনুবাদও সম্ভব নয়। এখনো সে পুথি পড়ার লোক হস্তিনাপুরে পাওয়া যায় নি। আমি দু-জনকে সমুদ্রপাড়ের দেশে পাঠাব বলে ঠিক করেছি। মোটের ওপর সে পুথি অনুবাদ হয়ে আসতে কম করে এক বৎসর।'

'তবে কী পুথি এলো?'

'এই দেখুন।' বলে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটি তোরঙ্গ খুলে একখণ্ড পুথি বের করে আনলেন বিচিত্রসূর্য। পুথির আয়তন সামান্য। কৌতূহলী ভূতমিত্র পুথিখানা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে বললেন, 'আর্যতত্ত্ব পরিচয়! এ কি কৃষিবিদ্যা বিষয়ক পুথি? কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না বাপু।'

'একদম নতুন বিষয়। আর্যজাতি কেন মহৎ তা নিয়ে আলোচনা।' বেশ উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন বিচিত্রসূর্য। 'এই পুথি পড়লে বুঝতে পারবেন যে কেন বিশুদ্ধ আর্যত্ব একমাত্র হস্তিনাপুরিদের মধ্যেই রয়েছে। ঝপাঝপ বিক্রি হচ্ছে মহাশয়!'

ভূতমিত্র চিন্তায় পড়লেন। হস্তিনাপুরিরা কেউ কেউ নিজেদের আর্য বলে থাকেন। আশ্রমেও এ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টি লঘু বলেই তিনি মাথা ঘামান নি। কিন্তু তা নিয়ে পুথি লিখে বাজারে ছাড়াটা খুব অবাক কান্ড। কে লিখল?

'রচয়িতার নাম কি আছে পুথিতে?'

'তা অবশ্য নেই। সে আর ক-টা পুথিতেই বা থাকে মহাশয়? কিন্তু বিষয়টি যে অভিনব তা মানতেই হবে। কেউ কেউ তো একাধিক কিনছেন

ভূতমিত্র চিন্তায় পড়লেন। হস্তিনাপুরিরা কেউ কেউ নিজেদের আর্য বলে থাকেন। আশ্রমেও এ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টি লঘু বলেই তিনি মাথা ঘামান নি। কিন্তু তা নিয়ে পুথি লিখে বাজারে ছাড়াটা খুব অবাক কান্ড। কে লিখল ?

উপহার দেবেন বলে। বলুন তো নকল করান শুরু করিয়ে দিই। হাতে চার-পাঁচ খণ্ডের বেশি নেই।'

'কোনও দরকার নেই।' ভূতমিত্র একটু কড়া ভাবে জানিয়ে দিলেন। 'ব্যাসদেব একশত বেদমন্ত্রের যে সংগ্রহ রচনা করেছিলেন সে পুথি আছে?'

'অবশ্যই!' বিচিত্রসূর্য মনে মনে আহ্লাদিত হলেন। সে পুথি বেশ মূল্যবান। চার মোহর। 'আপনার ক-খানা লাগবে বলুন।'

'মূল্য কি সেই তিন মোহর-ই আছে?'

'চার মোহর মহাশয়।' খুব লজ্জার সাথে বিচিত্রসূর্য জানায়। 'বৈদিক অক্ষর সবাই নকল করতে পারে না। তা ছাড়া ব্যাসদেবের কড়া নির্দেশ এক পাতায় দুটোর বেশি শ্লোক রাখা যাবে না। পাতার চারপাশে স্বস্তিসূচক অলঙ্করণ রাখতে হবে। মান বজায় রাখতে গেলে মূল্য না বাড়িয়ে উপায় ছিল না বুঝলেন?'

'হুম। তা পুথির পাটা কী কাষ্ঠে নির্মিত?'

'আজ্ঞে কোন কাষ্ঠ চাই আপনার?'

'সুগন্ধী রক্তচন্দন হলে ভাল হয়। কীটদ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।'

'আজ্ঞে কীটাক্রমণ প্রতিকারে আমরা বিশেষ রাসায়ণিক প্রতি পাতায় মাখিয়ে দিয়ে থাকি। খরচ মাত্র আধা মোহর প্রতি খণ্ড।'

'সেটাও করে দেবেন। তবে চন্দনপাটা দিয়ে বাঁধালে খণ্ড পিছু কত পড়ছে?'

'সাত মোহর মাত্র।'

'বেশি হলো যেন!'

'কী যে বলেন!' বিচিত্রসূর্য বিনয়ে, লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যায়। 'চন্দন কাষ্ঠের বাণিজ্য তো পুরোটাই অসুরদের হাতে। তাঁদের দেশেই পাওয়া যায় সরেস চন্দন। আসুরিক দ্রব্যমাত্র মূল্যবান। আপনি ভেবে দেখুন, হস্তিনাপুরি একাশ্ব রথ চাইলে আপনি তিরিশ মোহরে কিনতে পারেন, কিন্তু সেই একই মাপের আসুরিক রথ পঞ্চাশের নিচে পাবেনই না। নতুন আসা পুথিতে এটা বলা হয়েছে।'

'কী বলা হয়েছে?'

'আসুরিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে হস্তিনাপুরি পণ্য ক্রয়ের দিকেই আমাদের মন দেওয়া কর্তব্য।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার নতুন রথ কেনার মত অর্থ এবং ইচ্ছে হলে কোন রথ কিনবেন?'

'ইয়ে মানে অবশ্যই আসুরিক।'

'আমারও তেমন আসুরিক চন্দনপাটা লাগবে। মূল্য বেশি হলেও লাগবে। আপনি পঞ্চাশ খণ্ড তৈরি করুন। আর একখানা ওই নতুন পুথি দিন। মূল্য একত্রে পাবেন।'

'আহা!' বিচিত্রসূর্য খুব দুঃখ পেল। 'একখণ্ড আর্যতত্ত্বের মূল্য মাত্র এক মোহর। সে আপনাকে আমি দক্ষিণা রূপে দিচ্ছি মহাশয়। শত হলেও আপনি ভূতমিত্র। রাজকর্মচারিদের সন্তানেরা আপনার শিষ্য। একখণ্ড আপনার আশ্রমে গেলে তাঁরাও নিশ্চই পড়বে।'

'না। উদ্ভট পুথি পড়ার অনুমতি নেই আশ্রমে।'

একখণ্ড আর্যতত্ত্ব পরিচয় ঝোলায় পুরে ভূতমিত্র দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার কিছু শিল্পকর্ম ক্রয় করা দরকার। নয় জন বিশেষ মুণিকে সে সব দেওয়া হবে। কী কেনা হবে তা নিয়ে সাথে থাকা শিষ্যরা নিজেদের মত প্রকাশ করছিল। হস্তশিল্প সরণির দু-ধারের দোকানগুলির প্রত্যেকটাই নানা রকম শিল্পদ্রব্যে সুন্দর করে সাজান। সোমরস পানের জন্য রত্নশোভিত স্ফটিকের ঘটের পক্ষেই ছিল শিষ্যদের অধিকাংশের সমর্থন। এই নতুন ধরনের ঘটগুলি

সম্প্রতি বাজারে এসেছে। দেখলেই সোমরস পানের ইচ্ছে জেগে ওঠে।

তখনই দেখা গেল আশ্রমের আরো তিন চারজন আশ্রমিক উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে। ভূতমিত্রদের দেখে তাঁরা দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। মনে হলো তাঁরা কোনও বিশেষ সংবাদ বহন করছিল এবং তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওদের।

সত্যিই দেওয়ার মত অবাক করা সংবাদ বহন করে এনেছিল তাঁরা। ভূতমিত্র সে সংবাদে অবাক তো হলেনই, আনন্দও পেলেন। কিছুক্ষণ আগে আশ্রমে ফিরে এসেছে ভুসুকু। সে সুস্থ আছে। কিন্তু ঠিক কী হয়েছিল তা তাঁর মনে নেই।

অতিথিদের জন্য কেনাকাটা মাথায় উঠল। ভূতমিত্র তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন আশ্রমের দিকে। যজ্ঞের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত। আশ্রমে এখন মেলা বসে গেছে। এখন ভুসুকুকে ফিরে পাওয়া মানে অনেক সুবিধে। কিন্তু সবার আগে তাঁর সাথে কথা বলতে হবে। জানতে হবে ঠিক কী হয়েছিল। কেন সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সে বলছে, তাঁর কিছু মনে নেই— এটার অর্থ এই নয় তো সে কিছু গোপন রাখতে চাইছে? এই মুহূর্তে অবশ্য আশ্রমিকরা সবাই যজ্ঞের আয়োজন নিয়ে মত্ত। ভুসুকুর ফিরে আসা নিয়ে তাঁর খুব একটা আগ্রহ দেখাবে না।

আশ্রমে ফিরে ভূতমিত্র দেখলেন একদল ছাত্র মহোল্লাসে দুর্যোধনের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ব্যাপার কিছুই নয়। দুর্যোধন আগামিকাল বিপুল দানসামগ্রি পাঠাবেন বলে লোক পাঠিয়ে জানিয়েছেন। সে কারণেই এত উল্লাস। ভুসুকুর খোঁজ করে তিনি জানতে পারলেন সে কিছুক্ষণ অদত্তের সাথে কথা বলেছে। তারপর পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করবে বলে গেছে নিজের কুটিরে।

'ভুসুকু বলেছে আশ্রমেই সে ছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখে একটা জঙ্গলে পড়ে আছে। জঙ্গলটা বৃহত্তর হস্তিনাপুর লাগোয়া একটা ছোট জঙ্গল। হিংস্র প্রাণী নেই। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সে কয়েকজন পথিকের সাক্ষাৎ পায়। তাঁরাই বলে দেয় সে কোথায় আছে। তারপর সে ফিরে আসে।

অদত্তকে জিগ্যেস করতে সে বলল কথাগুলো। ভূতমিত্র আদেশ দিলেন ভুসুকু কুটির থেকে এদিকে এলেই যেন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়।

৩৬

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের একটু পরে হস্তিনাপুরের রাজকীয় অংশ থেকে এক অশ্বারোহী দ্রুত বেগে নিষ্ক্রান্ত হলো। তাঁর সর্বাঙ্গ শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। কেবল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। ইনি আসলে দুর্যোধন। একটু আগে গুপ্তচরের মুখে একটি বিশেষ সংবাদ পেয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে চলেছেন কর্ণের কাছে। ভূতমিত্রের আশ্রমে এক গুপ্তচরকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি। সে স্বেচ্ছাসেবক সেজে যজ্ঞের কাজে সহযোগিতা করছিল আর নজর রাখছিল আশ্রমের ওপর। তাঁর কাছে থেকেই দুর্যোধন জেনেছেন যে ভুসুকু ফিরে এসেছে।

ভুসুকু ফিরেছিল বিকেলের দিকে। কিন্তু গুপ্তচরটি আশ্রমের এক প্রান্তে এক রগচটা মুণির ফাইফরমাস খাটায় ব্যস্ত ছিল বলে জেনেছে অনেক পরে। তারপরেই সুযোগ বুঝে দৌড়ে গেছে দুর্যোধনের কাছে। যাওয়ার আগে একটু অনুসন্ধানও করে গেছে। সে জেনেছে যে ভুসুকু খুব ক্লান্ত। আজ রাতে সে আর নিজের কুটির থেকে বের হবে না। অদত্তের কাছ থেকে জেনেছে ভুসুকুর যেমন হওয়ার কথা তেমনই হয়েছে। কী হয়েছে সেটা অবশ্য সে বোঝে নি। কিন্তু দুর্যোধন বুঝেছেন। অদত্তকে বলা ছিল ভুসুকু ফিরে এলে তাঁকে যেন একটা বিশেষ প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নের উত্তরে সে যদি দুর্যোধনের হয়ে কাজ করার কথা জানায়, তবে বুঝতে হবে সে যা হওয়ার তাইই হয়ে এসেছে।

দুর্যোধন অবশ্য ভুসুকুর ফিরে আসার সংবাদে খুশির তুলনায় অবাক হয়েছেন অনেক বেশি। কারণ যমারণ্যে পাড় করে বিশেষ একটি গ্রামে ভুসুকুকে সম্মোহন করার কথা অল্লারাজের।

ভুসুকু ফিরেছিল বিকেলের দিকে। কিন্তু গুপ্তচরটি আশ্রমের এক প্রান্তে এক রগচটা মুণির ফাইফরমাস খাটায় ব্যস্ত ছিল বলে জেনেছে অনেক পরে। তারপরেই সুযোগ বুঝে দৌড়ে গেছে দুর্যোধনের কাছে। যাওয়ার আগে একটু অনুসন্ধানও করে গেছে। সে জেনেছে যে ভুসুকু খুব ক্লান্ত।

তারপর আবার যমারণ্য দিয়ে ফিরে আসা। সেটা হলে ভুসুকুর ফিরে আসাটা অবিশ্বাস্য রকম তাড়াতাড়ি হয়েছে। অবশ্য অল্লরাজ পরিকল্পনা বদল করতে পারেন। সে বা পুন্ডরীকাক্ষ ফিরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এখনো তাঁদের দিক থেকে কোনও বার্তা আসে নি।

কর্ণ আজ রাতে নৃত্যগীতাদি উপভোগ করবেন বলে একটি বিশিষ্ট নাট্যশালায় আছেন। দুর্যোধন সেদিকেই চলেছেন। সব সময় দুর্যোধন হয়ে পথে বের হওয়ার অনেক অসুবিধে। তাই গোপনে নাকমুখ ঢেকে বেরিয়েছেন তিনি।

নাট্যশালার বাইরে সুসজ্জিত আলোকিত প্রাঙ্গণে সুবেশা নরনারী ভিড় করে রহস্যালাপ করছে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে অতি সুক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত মঞ্চ। একটু আগেই একটি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়েছে। পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরুর আগে নাগরিকেরা পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপে ব্যস্ত। সদ্য বয়োপ্রাপ্ত পুরুষেরা বিভিন্ন প্যাঁচের পাগড়ি পরে কিশোরীদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত। কেউ উচ্চস্বরে নিজেদের রথচালনার দক্ষতার বড়াই করছে বন্ধুর কাছে। নটনটিদের কলানৈপুণ্য নিয়ে জোরদার আলোচনা করছে যুবকের দল। যুবতীরা শুনছে আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। প্রবীণরা সোমরস সেবনেই বেশি মন দিয়েছেন।

দুর্যোধন রাশ টানলেন। ঘোড়া পা ঘষটে থেমে গেল। মূল প্রাঙ্গণে ঘোড়া নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। দুর্যোধন এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘোড়া রাখার স্থান খুঁজতে লাগলেন। তখনই কোত্থেকে কর্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হাতের আঙটিগুলো খুলে আসো নি বন্ধু। ও দেখেই তোমায় চিনে ফেললাম। কী ব্যাপার?'

'একটু আড়ালে চলো। কথা আছে।'

লোকজন থেকে একটু সরে এসে দুর্যোধন ঘোড়া থেকে নামলেন। কর্ণ এসে দাঁড়ালেন পাশে। কিন্তু কর্ণের একজন দেহরক্ষীর মনে হল যে তাঁর প্রভু এমন এক আগন্তুক অশ্বারোহীর সাথে বাক্যালাপ করছেন যে বেশ সন্দেহজনক। দেহরক্ষী তাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দুর্যোধনের উদ্দেশে বলল, 'এই যে মহাশয়! আপনার পরিচয়?'

দেহরক্ষী একটু কাছেই চলে এসেছিল। দুর্যোধন দড়াম করে এক লাথি মারতে সে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে মূর্চ্ছা গেল।

'ভৃত্যদের আমি আস্তেই আঘাত করি। এতে ওরা সাময়িক মূর্ছা যায় আর জ্ঞান ফেরার পর আজীবন স্মরণ রাখে।'

দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ আমোদ পেলেন। দেহরক্ষীর চেহার অতিকায় কুস্তিগিরের মত। তাঁর জোরও সাঙ্গাতিক। কিন্তু কী অনায়াসে একটি মাত্র নিখুঁত পদাঘাতে তাঁকে শুইয়ে দিয়েছেন দুর্যোধন। একটা পদাঘাতই বলে দেয় তিনি কী মাপের যোদ্ধা।

দুর্যোধনের মুখে ভুসুকুর ফিরে আসার সংবাদ কর্ণকেও বিস্মিত করল। 'সে কি সম্মোহিত হয়েছে না পালিয়ে এসেছে?' সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন তিনি। শুনে দুর্যোধন দুঃখিত হলেন। রাজকীয় কৃষ্ণবাহিনীর চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসা যে আদৌ সম্ভব নয়, তা মনে করিয়ে দিলেন বন্ধুকে। 'আমি নিশ্চিত অল্লরাজ কাজ সমাধা করেই ফেরৎ পাঠিয়েছেন তাঁকে।'

'সেটাই সম্ভব।' কর্ণ স্বীকার করলেন। 'তাহলে অল্লরাজ কিংবা পুন্ডরীকাক্ষও আজকালের মধ্যে হস্তিনাপুর ফিরছে। কিন্তু মনে রেখো বন্ধু আশ্রমে যজ্ঞ শুরু হতে যাচ্ছে। মনে হয় না আগামি এক

সপ্তাহ আমরা ভুসুকুর সাথে যোগাযোগ করে কথা বলতে পারব।'

দু-জন নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলেন না। ওদিকে আবার মঞ্চে অনুষ্ঠান শুর হওয়ার চিহ্ন দেখা যেতে লাগল। নাগরিকেরা সেদিকে জড়ো হতে লাগলেন। কেবল দুটি অল্পবয়সী মেয়ে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে একসাথে হাঁটা শুরু করল। মেয়ে দুটি ছিল মধুক্ষরা আর তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সই লোপামুদ্রা। দু-জনের বাড়ি থেকে সবাই এসেছে নাট্যশালায়। কিন্তু মধুক্ষরার ভাল লাগছিল না। তাঁর মন ছিল চঞ্চল। সে বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় লোপামুদ্রা তাঁর সাথে বেরিয়ে এসেছে।

'উচ্চাঙ্গের অভিনয় সন্দেহ নেই কিন্তু আমার এসব খুব একটা ভাল লাগে না।' লোপামুদ্রা হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'আমার ভাল লাগে। কিন্তু আজ ঠিক মন বসাতে পারছিলাম না সই।' মধুক্ষরা ভাল করে গরম বস্ত্রে কানমাথা ঢেকে জানাল। শীতের দাপট সামান্য কমলেও এত রাতে তা বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। মূল হস্তিনাপুর নগরে রাতের বেলায় পথিক নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারে। কিছুটা হাঁটার পর একটা রথ পেল তাঁরা। সারথি এক প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি দু-জনকে রথে তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'অভিনয় ভাল লাগল না বুঝি? নগরে যে ভাবে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে তাতে মনে হতেই পারে যে নটনটীরা সবাই গন্ধর্বজাত, নাট্যকার যেন সাক্ষাৎ ভরতমুণি— বাস্তবে কিন্তু তা নয়। নাটকটি আমি কাল দেখেছি। কী বলব বালিকা তোমাদের— আধা প্রহরের বেশি থাকতেই পারি নি। অবশ্য অভিনয় ক্ষমতা মন্দ নয়, গানের সুরেও বৈচিত্র্য আছে কিন্তু নাট্যাংশের সংলাপ উদ্ভট সব উপমাযুক্ত। অন্য কোথাও এ নাটক অভিনয় করে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু হস্তিনাপুরে এসব চলবে না।'

'আমার তো শিরঃপীড়া হয়েছে।' কথা বলার একটা ফাঁক পেয়ে বলল লোপামুদ্রা।

'স্বাভাবিক।' সারথি পুনরায় উৎসাহ পেল যেন। 'ভোর অব্দি জেগে যদি পুরোটা দেখতেন তবে শিরশীতল তৈল মেখে ঘুমোতে হত। তবে সত্যি বলতে কি, মাথা ঠান্ডা করার জন্য শিরশীতল তৈল অতটা ভাল নয় যতটা লোকে বলে। এর চাইতে মস্তকমলম অনেক কার্যকর। তবে মস্তকমলম অসুরদের জিনিস। শিরশীতল কাজে একটু দুর্বল হলেও হস্তিনাপুরি উৎপাদন। তাই বলি বালিকারা ঘরে ফিরে একটু শিরশীতল মেখে নিও।'

'খারাপ জিনিস মাখব কেন?' লোপামুদ্রা আবার কথা বলার সুযোগ পেল। 'মস্তকমলম-ই মাখব।'

'তা মাখতে হবে বৈ কি! তবে একটু শিরশীতলও মাখবে। আর্য হতে হলে হস্তিনাপুরিদে স্বনির্ভর হতে হবে। এ নিয়ে একটি চমৎকার পুথি বেরিয়েছে। —আচ্ছা, তোমাদের কী মনে হয়? আমরা কি আর্য নামক শ্রেষ্ঠ জাতির রক্ত বহন করছি না?'

'মাথা ধরে গেছে। এত কঠিন চিন্তা করতে পারছি না। আপনি দক্ষিণ দিকর দুই সংখ্যক পথটা ধরুন।'

লোপামুদ্রার কথায় সারথি চুপ করল না। বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগল চমৎকার সেই পুথিটার বক্তব্য। দেখতে দেখতে রথ এসে থামল মধুক্ষরার বাড়ির সামনে। পথের কোণায় যে মশালটা জ্বলছিল সেটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। সারথি তাই মধুক্ষরার বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা রথগুলো দেখতে পেল না। দেখলেই বুঝত যে বাড়িতে রথচালক কেউ বাস করেন। বুঝলে নির্ঘাৎ আরো খানিকটা বক বক করত তাঁদের সাথে।

'হস্তিনাপুরি দ্রব্য ব্যাপারটা মাথায় রেখো। আমাদের একটা জাতিগত পরিচয় দরকার।'

সারথি যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে মনে করিয়ে দিল। লোপামুদ্রা এবার খিলখিল করে হেসে মধুক্ষরার হাত ধরে টান মারল ভেতরে যাওয়ার জন্য। ভেতরের উঠোনে জ্বালিয়ে রাখা মশালটি অবশ্য জ্বলছিল বেশ তেজের সাথে। হলুদ আলো

আর কালো ছায়ায় ঢাকা মধুক্ষরাদের বাড়িটায় তখন আর কেউ নেই। ওরা দু-জন উঠোনে এসে দাঁড়াল।

তখনই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল দুটি মানুষ।

৩৭

রাত্রি প্রথম প্রহরের সিকি ভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহাবলী সমেত পাণ্ডবেরা বৃহত্তর হস্তিনাপুরের সীমানায় উপস্থিত হলেন। হস্তিনাপুর নগরি তিন ভাগে বিভক্ত। একদম কেন্দ্রে রাজকীয় অঞ্চল। তাকে ঘিরে মূল হস্তিনাপুর এবং মূলকে ঘিরে বৃহত্তর হস্তিনাপুর। এই একই সীমানা দিয়ে আগামী কাল মহিষাসুর নগরে প্রবেশ করবেন বলে সেখানে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ওরা ছ-জন লোকলশকর সমেত প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করে ভেতরের আসতেই কোথা থেকে এক ব্যক্তি হাসিমুখে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহাশয়েরা নিশ্চই রাতটুকু এখানেই কোনও পান্থশালায় থাকবেন বলে স্থির করেছেন?'

'পান্থশালায় থাকব বলে অবশ্যই স্থির করেছি।' যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন। 'তবে এখানে নয়। মূল নগরীর বিদেশি দূতাবাসের কাছাকাছি কোনও ভাল পান্থশালায়।'

'সেখানে পৌঁছোতে মহাশয়দের সময় লাগবে। বাকি রাতটুকুর জন্য অতিরিক্ত মুদ্রা খরচ করে সেখানে থাকা মিতব্যায়িতার লক্ষণ বলে ভাবছেন মহাশয়েরা? তা ছাড়া সাথে লোকজনও আছে দেখছি।'

'ওরা ওদের জায়গা খুঁজে নেবে। তোমার তেমন কোনও পান্থশালা জানা থাকলে বলো।' যুধিষ্ঠির ঘোড়া হাঁকানর উদ্যোগ নিলেন।

'থামুন থামুন।' লোকটি ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। 'সত্যি বলতে কি বিদেশি দূতাবাসের পাড়ায় গণপতির পান্থশালাটি এক কথায় অতুলনীয়। চাইলে আমি আপনাদের সাথে গিয়ে সেখানে সব কিছু ঠিক করে দিতে পারি। দরাদরি করে কিছু কমও করে দেব। যদিও গণপতির পান্থশালা বেশ মহার্ঘ কিন্তু আপনাদের দেখে মালুম হচ্ছে গরীব মানুষ হতেই পারে না।'

ভীম দুম করে জিগ্যেস করে ফেলল, 'কেন মালুম হচ্ছে ভাই?'

ভীমের জলদ গম্ভীর স্বরে লোকটি একটু থতমত খেয়ে বলল, 'আজ্ঞে আপনাদের ঘোড়ার চেহারা, পরনের মূল্যবান শীতবস্ত্র দেখে কে গরীব বলে ভুল করবে মহাশয়। গণপতির পান্থশালা খরচ আপনাদের কাছে নস্যি।'

'চলো সেখানে।' যুধিষ্ঠির তাড়া দিলেন। লোকটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ঘোড়া যোগার করে সওয়ার হয়ে বলল, 'দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন। আপনারা নিশ্চই হস্তিনাপুরে এই প্রথম?'

যুধিষ্ঠির নীরব রইলেন। অর্জুন উদাস ভাবে বললেন, 'কত কিছু দেখি নি ভাই।'

'হস্তিনাপুরে প্রাণ ভরে দেখবেন।' লোকটি এগোতে শুরু করল। অর্জুন ঠিক তাঁর পাশাপাশি চলতে চলতে কৌতূহলী স্বরে জিগ্যেস করল, 'কী কী দেখব ভাই?'

'সে তো বলে শেষ করা যাবে না মহাশয়। তবে হস্তিনাপুরে এখন যা যা চলছে তা একটু শুনে নিন। এটা না জানলে আপনি হস্তিনাপুরের সাম্প্রতিক ধারাটাই বুঝতে পারবেন না মহাশয়।'

'সেটা কী ভাই?'

'আর্যামি।'

'সে আবার কী বস্তু ভাই?'

'হস্তিনাপুরিদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। দাবী করা হচ্ছে যে তাঁরা আর্য। একেই বলে আর্যামি। নতুন একটা পুথিও বেরিয়েছে। দারুণ বিক্রি।'

ভীম আবার বেশ জোরে বলে ফেলল, 'দাদা! এ সব কী হচ্ছে?'

যুধিষ্ঠির তাঁকে ইশারায় শান্ত হতে বললেন। অর্জুন অবশ্য শান্ত ভাবে যেন খুব কৌতূহলী এমন ভঙ্গীতে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। রাত বেশ গভীর হলে এক সময় তাঁরা এসে পৌঁছোল মূল হস্তিনাপুর নগরীর বিদেশী দূতাবাসের পাড়ায়।

বলাই বাহুল্য যে 'গণপতি পান্থশালা'র ব্যবস্থা অতি উত্তম। ব্যবস্থাপক মহাশয় প্রায় মধ্যরাতে এতজন অতিথির আশাই করেন নি। তিনি আপ্লুত স্বরে বললেন, 'আপনার চাইলে আমাদের বিশেষ কুটিরগুলি ব্যবহার করতে পারেন। দক্ষিণা অবশ্যি আপনাদের কাছে কিছুই নয়, মাত্র দশ মোহর। বিনিময়ে সাতখানি অপূর্ব কুটিরে সাজান একখানি বাগান পাবেন। ভোজনাদির খরচ ওই দশের মধ্যেই।'

যুধিষ্ঠির ট্যাঁক থেকে দশটা মোহর গুণে ঝনাৎ করে ব্যবস্থাপকের সামনে ফেললেন। তিনি আরো বেশি আপ্লুত হয়ে বললেন, 'মহাশয়রা বুঝি গন্ধবণিক? নাকি মশলার কারবারি?'

যুধিষ্ঠির নীরব রইলেন। অর্জুন উদাস সুরে বললেন, 'মোহর আসে মোহর যায়। এই তো জীবন!'

'তা বটে, তা বটে। ভোজনাদির আয়োজন করি?'

'দশজনের খাদ্যসামগ্রি পাঠাবেন মহাশয়।' যুধিষ্ঠির বাক্যটি উচ্চারণ করে ভেতরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন। ব্যবস্থাপক নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের। বাগান আর কুটিরের ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলেন পাণ্ডবেরা। তারপর ব্যবস্থাপক সব বুঝিয়ে চলে যেতেই ভীম হাউমাউ করে বলতে শুরু করল— 'কী ব্যাপার বল তো দাদা? আমাদের এখানে রাত্রীবাস করাচ্ছিস কেন? আমরা তো ঘরে ফিরে যেতে পারতাম।'

দেখা গেল বাকিরাও সমান উৎসুক। যুধিষ্ঠিরকে ওরা ঘিরে ধরল।

'রাতে না ঘুমোলে অসুবিধে নেই তো?' সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির। সকলেই একবাক্যে বলল যে ঘুমের কোনও দরকারই নেই। শরীর রীতিমত তাজা। ভ্রমণ ছাড়া আর তো কোনও পরিশ্রমই হয় নি!

'বেশ।' যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে বোঝাতে শুরু করলেন। 'রাতে ভোজনাদি সাঙ্গ করার পর আমরা অপেক্ষা করব। তৃতীয় প্রহর শেষ হলে বেরিয়ে পড়ব চুপি চুপি। আমরা সবাই ছদ্মবেশে আছি। এই অবস্থায় আমি একটি উত্তেজনাপূর্ণ কাজের কথা ভাবছি। আমরা আজ গোপনে সাগরদেশের দূতাবাসে প্রবেশ করব। সে দূতাবাস এখান থেকে কাছেই।'

'বলিস কী?' অর্জুন লাফিয়ে ওঠেন। 'লুকোচুরি খেলতে আমার দারুণ লাগে।

'কিন্তু এটা খেলা নয় পার্থ! দূতাবাসে আসলে কী হয় তা যতটা সম্ভব জেনে নিয়ে আমাদের ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসতে হবে।'

'ঢুকব কী ভাবে?'

'রদ্দা মেরে রক্ষীদের ঘুম পাড়িয়ে দেব!' সহদেবের প্রশ্নের উত্তর এলো ভীমের কাছ থেকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির তক্ষুনি সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন, 'পেছন দিকের প্রাচীর টপকে ঢুকতে হবে। নকুল পাশাস্ত্র প্রয়োগ করবে। পাশ বেয়ে উঠে যাব আমরা। আমি ভুসুকুর মুখে যা শুনেছে তাতে পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাটাই যুক্তিসম্মত।'

'কিন্তু বড়দা!' নকুল বলে। 'নগররক্ষীদের চোখে পড়ে যাব। তাঁদের কেউ না কেউ সে দিকে পাহারায় থাকবে।'

'হুম।' যুধিষ্ঠিরকে একটু চিন্তিত দেখাল। 'বশীকরণ রদ্দা তোমাদের মধ্যে কে ভাল রপ্ত করেছ?'

বাকিরা এর ওর মুখ চাইতে লাগল। বোঝা গেল এ হেন রদ্দার খবর তাঁদের কাছে নেই।

'বশীকরণ রদ্দা হল এক ধরনের রদ্দা যা ঘাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় মারলে কিছুক্ষণের জন্য আঘাতপ্রাপ্তের মাথা কাজ করে না। আমি শিখেছিলাম। তবে ভালমত রপ্ত হয়েছে কি না বলতে পারছি না।'

ঠিক হল অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

তৃতীয় প্রহর শেষ হওয়ার সামান্য আগে ওরা চুপি চুপি বেরিয়ে গেল পান্থশালা থেকে। বাগানের দু-দিকে প্রবেশ দ্বার আছে। তার একটা দিয়ে বাইরের রাজপথে ওঠা যায়। অতিথিরা যাতে ভোর

যুধিষ্ঠির একটা বড়ো গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভাল মত পর্যবেক্ষণ করে নিলেন। তাঁরা ভবনের পেছন দিকে রয়েছেন। সেদিক দিয়ে ভেতরের যাওয়ার একটা দ্বারও চোখে পড়ছে। সেখানে মশাল জ্বলছে একজোড়া। দুটো মুশকো চেহারার প্রহরী গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। তাঁদের একজনের হাতে ধনুক।

বেলা পাইচারি করতে বের হতে পারেন তাই এ ব্যবস্থা। ওরা ছ-জন অন্ধকারের মধ্যে মিশে সন্তর্পণে হাঁটতে লাগল। পথঘাট শূন্য। দু-একজন রক্ষীর দেখা মিলল বটে কিন্তু তাঁরা ওদের দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ এ ভাবে হাঁটার পর তাঁরা সাগরদেশের দুতাবাসের পেছনে এসে উঠল।

তখনই শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। একজন নগররক্ষী ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে।

'এটা দূতাবাস অঞ্চল মহাশয়।' রক্ষী বিনীত গলায় বলল। 'এত রাতে আপনারা এখানে কী কারণে বলবেন কী? পথ হারান নি তো?'

'আপনার নাম?'

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে রক্ষী একটু অবাক হয়ে বলল, 'রক্ষীর নাম কেউ জানতে চায় না। তবে অধমের নাম কর্কট। আমি রাজকীয় নগররক্ষী বাহিনীর সদস্য। আপনাদের পরিচয়?'

'ও ভীম। ও নকুল। ও সহদেব।' যুধিষ্ঠির তিনজনকে দেখিয়ে তিনটে নাম বললেন।'

'চমৎকার!' রক্ষী হাসল। 'আশা করি উনি অর্জুন আর আপনি যুধিষ্ঠির? বাকি আরো একজন যিনি রইলেন তিনি কি দুর্যোধন? তা সে যাই হোক! এবার বলুন আপনারা পাণ্ডবের দল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে এত রাতে এখানে কী করছেন?'

'ঘোড়া থেকে না নামলে বোঝা যাবে না।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় রক্ষী আরেকটু অবাক হয়ে টক করে ঘোড়া থেকে নেমে দু-তিন পা এগিয়ে এসে বলল, 'এবার নিশ্চই বোঝাতে পারবেন যুধিষ্ঠির মহাশয়?'

'পেছনে তাকাও।'

লোকটা আরো একটু অবাক পেছনে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিদ্যুতের মত যুধিষ্ঠিরের হাতটা ছোবল মেরে দিয়েছে তার আগেই। ঘাড়ের পেছনে মোক্ষম একটা আঘাত পড়তেই রক্ষীর গোটা শরীর একবার কেঁপে উঠল। তারপর কয়েক পলক সে দাঁড়িয়ে থাকল স্থাণুবৎ।

'কেমন বোধ করছ কর্কট?'

যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল। কর্কট হতভম্বের মত ওদের দিকে ফিরে বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, 'কে আমি? কোথায় আমি? কেন আমি?'

'বশীকরণ না হলেও বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যুধিষ্ঠির। 'আসলে অনেক দিন অভ্যেস নেই তো। মনে হয় এতেই চলবে।'

রক্ষী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে হতবুদ্ধির মত ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে লাগল সামনের দিকে। দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দ্রুত পাশাস্ত্র তৈরি করে ছুঁড়ে দেওয়া হল দূতাবাসের প্রাচীর লাগোয়া একটি গাছের ডালে। কয়েক পলকের মধ্যে ছয় জন দড়ি বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে।

ঢং ঢং করে তৃতীয় প্রহর শেষের ঘণ্টা বাজল কোথাও।

৩৮

মাটি ফুঁড়ে দুটো ছায়ামূর্তি উঠে আসায় পলকের জন্য ভয় ও বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেও মধুক্ষরা নিজেকে সামলে নিয়ে ছিটকে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কড়া গলায় জিগ্যেস করল, 'কে আপনারা? চোরের মত লুকিয়ে ছিলেন কেন?'

'আমি।' অনুচ্চ স্বরে একটা ছায়ামূর্তি উচ্চারণ করল। এইবার মধুক্ষরার চোখ গোল হয়ে হয়ে গেল মহাবিস্ময়ে। একটু এগিয়ে এসে চোখের

গোলত্ব বজায় রেখে বলল, ‘তুমি? তুমি কোথায় ছিলে এ ক’দিন?’

তারপরেই সে ভুসুকুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ভুসুকু আর চার্বাক অনেক বুদ্ধি পরামর্শ করে মধুক্ষরার সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়েছিল। বাড়িতে কেউ নেই দেখে অনুমানের ভিত্তিতে গানের আসরের দিকে যাবে বলে ঠিক করতেই দেখেছিল মধুক্ষরা সাথে একজনকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। মোট কথা তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় অনেক জটিল ও সুক্ষ্ম বিষয় থাকলেও যা ঘটল তা আদৌ ধারণার মধ্যেও ছিল না। ফলে মধুক্ষরাকে বুকে নিয়ে ভুসুকু কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল। লোপামূদ্রা ক্ষণিকের জন্য বাক্যহারা হয়ে থাকার পর আর কিছু খুঁজে না পেয়ে চার্বাকের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি কে মশাই?’

‘আমি চার্বাক।’ কিছু একটা কাজ পেয়ে চার্বাকও যেন নিজেকে ফিরে পেল। ‘ভুসুকুবাবু আমার বন্ধু। হস্তিনাপুরে আমাকে সবাই জড়বাদী বলে জানে। বেদের বিরোধিতা করাই আমার কাজ।’

‘এত রাতে এখানে কী করছেন?’

‘আজ্ঞে ভুসুকুবাবু কী করছেন তা তো প্রত্যক্ষযোগ্য। আমি বা আপনি যে সেটা করছি না, সেটাও প্রত্যক্ষযোগ্য।’

মনে মনে হাসি চেপে লোপামূদ্রা বেশ গম্ভীর স্বরে মধুক্ষরার উদ্দেশে বলল, ‘তোর কান্নাকাটি হলো রে মধু?’

মধুক্ষরা তক্ষুনি এক ঝটকায় ভুসুকুর বুক থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, ‘হ্যাঁ’

‘তা হলে অতিথিদের নিয়ে চল কোথাও বসি। এত রাতে এঁরা নিশ্চই তোর কান্না শোনার জন্য আসেন নি?’

‘পরিস্থিতি জটিল।’ এতক্ষণে ভুসুকুর স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ কন্ঠ শোনা গেল। চার্বাক কয়েক দিন ধরেই আশ্রমে যজ্ঞের আয়োজন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নানা দেশ থেকে আসা মুনিদের উদ্ভট সব প্রশ্নজালে বিব্রত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর এই চেহারাটা ছিল বাইরের। ভেতরে ভেতরে সে আসলে পালন করছিল গুপ্তচরের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন স্বয়ং ব্যাসদেব। তিনি হঠাৎ করে লোক পাঠিয়ে চার্বাককে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর সাথে সৈন্ধবদের ভাষা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর অনুরোধ করেছেন ভূতমিত্রের আশ্রমের ওপর চোখ রাখতে। দরকারে ব্যাসদেব আবার তাঁকে ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ শুনে নেবেন।

অন্যদিকে ভুসুকুর ব্যাপারেও সে যে অবহিত ছিল এমন নয়। কিন্তু ব্যাসদেবের তাঁকে বলেছিলেন যে ভূতমিত্রের আশ্রমের মাহুত ভুসুকু একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠতে যাচ্ছে এবং বর্তমানে সে নিরুদ্দেশ। সুতরাং চার্বাক আদৌ ভাবেই নি যে আশ্রমে ভুসুকুর সাথে তাঁর দেখা হতে পারে। আজ প্রথম রাতে সে যখন আশ্রমিকদের আলোচনা থেকে টের পেল যে ভুসুকু নামক ব্যক্তিটি ফিরে এসেছে, তখনই সে সকলের অলক্ষ্যে ভুসুকুর কুটির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। ভুসুকুকে নিজের পরিচয় দিলে সে একটু অবাক হয়ে বলে, ‘আপনি চার্বাক? যুধিষ্ঠির আপনার কথা বলেছিলেন। আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।’

চার্বাক তখনই বুঝতে পারে যে ব্যাসদেব ঠিক কথাই বলেছেন। এই লোকটার সাথে যুধিষ্ঠিরের যোগাযোগ আছে। সে তখনই চার্বাককে বন্ধুতার প্রস্তাব দেয়। চার্বাক সে প্রস্তাব লুফে নিতে দেরি করে নি। তখন ভুসুকু তাঁকে সেই মুহূর্তের একটা ইচ্ছার কথা জানায়। সারথি উচ্চকপালের বাড়ি সে একবার যেতে চায়। সে সাথে থাকলে সুবিধে হবে।

চার্বাক সানন্দে ভুসুকুকে নিয়ে উচ্চকপালের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। ভুসুকু অবশ্য বলেছিল যে সে কেন যেতে চাইছে। সব শুনে চার্বাকের মনে হয়েছিল নিশ্চই কোনও হৃদয়ঘটিত ব্যাপার। ফলে গোটা রাস্তা উচ্চকপালের বাড়িতে গিয়ে বাড়ির লোকদের বুঝতে না দিয়ে ভুসুকু কী ভাবে মধুক্ষরার সাথে দুটো কথা বলতে পারে, সে ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ সে দিয়েছিল।

কিন্তু যেটা ঘটল সেটা সত্যিই অন্যরকম।

'আমার কিছু বলার আছে।' ভুসুকু আবার বলল। 'কিন্তু তোমার সাথে যাঁকে দেখছি সে কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'কথা যদি একান্ত ব্যক্তিগত হয় তবে আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। তোরা ঘরে যা।' লোপামূদ্রা জানিয়ে দিল। 'আমি আর চার্বাকবাবু বরং এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করি। মনে হচ্ছে উনি নগরের বিশিষ্ট একজন।'

'এখনো তেমন বিশিষ্ট হই নি। তবে যুবরাজ যুধিষ্ঠির আমার প্রশংসা করেছেন।'

ওরা দু-জন ভেতরে চলে গেল। লোপামূদ্রা বলল, 'যদি গানের ওখানেই থেকে যেতাম তবে তো আর দেখা হত না।'

'আমরা তো সেখানে যাব বলেই স্থির করেছিলাম।' বেশ খুশি খুশি শোনাচ্ছিল চার্বাকের গলা। 'আচ্ছা, আপনারা কি রথে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। সে এক সারথি জুটেছিল বটে! হস্তিনাপুরের জাতিগত পরিচয় নিয়ে বক বক করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।'

'এই জাতিগত পরিচয় ব্যাপারটা নিয়ে কি আপনি বিশদ কিছু জানেন?'

'তা জানি না। তবে এটাই এখন চলছে।'

'বাঃ! অসাধারণ উক্তি! এই যে বললেন, এটাই এখন চলছে— এটাই হলো জড়বাদের অন্যতম হেতুবাক্য। প্রধান হেতুবাক্যও বলতে পারেন।'

'ক্ষমা করবেন মহাশয়! আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমি দুঃখিত। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম যে এর পেছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে। আপনার মত হস্তিনাপুরের আরো হাজার হাজার নাগরিক বুঝতে পারছে না যে কী ভাবে বিভেদ ছড়ান হচ্ছে!'

'বিভেদ? মহাশয় দেখছি রহস্যালাপে বেশ পারদর্শী। কোন বিভেদের কথা বলছেন আপনি?'

'কৌরবদের সাথে পাণ্ডবের।'

'কী যে বলেন!' লোপামূদ্রা চমকে উঠল। সে কেন, তাঁর মত হাজার হাজার হস্তিনাপুরীর কাছে এমন একটা বিভেদ সত্যিই অকল্পনীয়। 'আমরা সকলেই জানি যে কুরুবংশের সম্পদ হলো ঐক্য।' সে বলতে লাগল। 'মনে হচ্ছে জড়বাদ অনুশীলনের ফলে আপনার মনে বিভ্রান্তি এসেছে মহাশয় চার্বাক!'

'আমার মন শান্তই আছে মহাশয়া!' চার্বাক বিন্দুমাত্র রাগ করল না। 'কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ কিছু এখন বলা সম্ভব নয়। তবে যুবরাজ রূপে দুর্যোধনকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা কি আপনার চোখে পড়ে নি?'

'দুর্যোধন যুবরাজ হবে?' লোপামূদ্রার মুখ দেখে মনে হল সে খুব দুঃখ পেয়েছে। 'গদা ঘোরান ছাড়া আর কী জানেন উনি? অসহ্য!'

দুই নবীন নারী-পুরুষ আরো কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চালিয়ে গেল। ক্রমশঃ তাঁদের আলোচনার বিষয় বদলাতে লাগল। দেখা গেল দু-জনেরই প্রিয় রঙ, খাদ্য, রথ— ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দারুণ মিল। এই ভাবেই গড়িয়ে গেল বেশ কিছুটা সময়। রাত ক্রমশঃ যেতে লাগল ভোরের দিকে।

ঠিক তখন বৃহত্তর হস্তিনাপুরের সীমানার একটি প্রবেশ দ্বারে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামল এক অশ্বারোহী। প্রবল শীতের কারণে চোখ বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে ঢাকা। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না ঘটলে রাতের বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে কেউ এ ভাবে আসে না। এঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।

অশ্বারোহী কিন্তু বিশ্রাম নিলেন না। তিনি ঘোড়া বদল করে আবার হাওয়ার গতিতে ছুটলেন মূল নগরির দিকে। ইনি আর কেউ নন। পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। তিনি জানেন ভুসুকু হস্তিনাপুরে পৌঁছে গেছে। সংবাদ কানাঘুষোয় দুর্যোধনের কানেও পৌঁছে যাওয়া উচিত। সে ক্ষেত্রে তাঁকেও হস্তিনাপুরে লুকিয়ে থাকতে হবে। এটাই অল্পরাজ অঙ্গারের নির্দেশ। সূর্য ওঠার আগেই তিনি তাই চাইছেন সাগরদেশের দূতাবাসে পৌঁছে যেতে।

(চলবে)

এ নদী কেমন নদী

শিলিগুড়ি শহর বাঁচাতে হলে ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি নদী বাঁচাতে হবে

তুহিন শুভ্র মন্ডল

শিরোনামে মহানন্দা নদীর কথা উল্লেখ করি নি। কিন্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে মহানন্দা শিলিগুড়ির প্রধান নদী। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রথম দেখি এই নদীকে। বলাই বাহুল্য, তখনকার মহানন্দা এখনকার মহানন্দার মত এতটা খারাপ অবস্থায় ছিল না। অল্প কিছুদিন হল ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল উত্তরবঙ্গের যে চারটি নদীকে সবচেয়ে দূষিত বলে ঘোষণা করেছে তার মধ্যে মহানন্দা রয়েছে।

মহানন্দা ও বর্তমান:

মহানন্দা নদী আন্ত সীমান্ত নদী। দার্জিলিং হিমালয়ের অংশ এই নদীর উৎপত্তিস্থল পূর্ব কার্শিয়াং- এর চিমলির নিকটবর্তী মহালদিরাম পাহাড় দেকে। মহানন্দার মোট দৈর্ঘ্য ৩৬০ কিমি। যার মধ্যে ৩২৪ কিমি ভারতবর্ষে প্রবাহিত। বাকি ২৪ কিমি বাংলাদেশে প্রবাহিত। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে অতিক্রম করে এই নদী মহানন্দা অভয়ারণ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমতলে এসে মিশেছে শিলিগুড়িতে।

দীর্ঘ গতিপথে মহানন্দার শাখা মূলত চারটি। বালাসন, মেচি, রাতোয়া, কঙ্কাই। শিলিগুড়ির অংশে এর তিনটি শাখানদী আছে। তৃনাই, রনোচন্ডী এবং চকোর-ডাউক। মহানন্দা ২০,৬০০ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হয় যার মধ্যে ১১,৫৩০ বর্গ কিমি ভারতবর্ষে প্রবাহিত। ইতিহাসে কথিত আছে যে মহানন্দা একসময় বিহারের কোশী নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তারা মিলিত হয়েছিল করতোয়ার সাথে।

সেই মহানন্দার এখন কী হাল?

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক National River Conservation Plan যে আটত্রিশ টি নদীর তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতেও রয়েছে মহানন্দার নাম। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে "The level of of BOD if fifteen times in Mahananda river indicating

বেহাল মহানন্দা নদী

high levels of pollution..."। হায়দ্রাবাদের মুসী, আমেদাবাদের সবরমতী, দিল্লির যমুনার সাথে উঠে এসেছে মহানন্দার নামও।

কী কী কারণে মহানন্দা দূষিত হচ্ছে?

মহানন্দার বুকে অবস্থিত খাটাল, খাটা পায়খানা, বিভিন্ন যানবাহন ধোয়ার কারণে মেশে গাড়ির তেল-মবিল, নদী পাড়ের শ্মশান-বর্জ্য, মৃত পশুর দেহ, প্রতিমা বিসর্জনজনিত জলদূষণ, ছট পূজোর সময় দূষণ, ধোপাদের জামাকাপড় কাচা, শহরের সমস্ত কঠিন ও তরল বর্জ্য মহানন্দা নদীতে মেশা ইত্যাদি কারণে মহানন্দা নদীর দূষণ সর্বাধিক। খালি চোখে দেখেই বোঝা যায় যে মহানন্দা নদীর জলে ব্যাকটেরিয়া, কলিফর্মের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি।

মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের খবর কী?

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা যুগল কিশোর সাহার সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন এই মহানন্দা নদীতে একসময় প্রচুর ধরণের মাছ পাওয়া যেত। বোরলি, ধরেঙ্গা, পুঁইয়া, বেলে, চ্যালা, বোয়াল ছিল তার মধ্যে অন্যতম। কীভাবে এবং কবে যে এগুলো হারিয়ে গেল তা আমরা কী ভেবেছি? শোনা যায়, মহানন্দা নদীকে বাঁচাতে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল। তার বর্তমান অবস্থা কী? ২০০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে যে MAP বা মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেটা কি আদৌ বাস্তবায়িত হবে?

কী বলছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ?

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আগেই ঘোষণা করেছে, শরীরে বিষ নিয়ে বইছে মহানন্দা। ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনালও সম্প্রতি মহানন্দাকে দেশের মধ্যে সবচাইতে দূষিত নদীর অন্যতম বলে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিকা দেবেন বলে জানিয়েছেন মাটিগাড়াতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিক।

কী বলছেন শিলিগুড়ির মেয়র?

সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে দেখা করা হয়েছিল শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের সাথে। মহানন্দা নদীকে নিয়ে তার ভাবনা ও উদ্যোগের কথা সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন আমাদের। শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কিংবা বর্তমান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে মহানন্দার বিষয় জানিয়েছেন। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও। কিন্ত কিছু হয় নি। আমাদের প্রশ্ন ছিল, শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনও তো নিজে উদ্যোগ নিতে পারে? সেটাই বা কতটা হয়েছে? সেক্ষেত্রে তিনি তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিকাশী নালার মুখে একটি করে জালিকার কথা বলছিলেন। সেটা হলেও কঠিন বর্জ্যের কী হবে? পর্ষদ বলেছে মহানন্দা নদীর জল পানের অযোগ্য শুধু নয় স্নানেরও অযোগ্য। নানান চর্মরোগ অবশ্যম্ভাবী।

মহানন্দা বাঁচাতে পরিবেশ প্রেমী সংস্থাগুলি:

শিলিগুড়ির অন্যতম জীবন রেখা মহানন্দা নদী বাঁচাতে বিভিন্ন পরিবেশ সচেতন সংস্থাগুলি বিভিন্ন সময়ে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিলিগুড়ির হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ে সরব। এছাড়াও, সেভ শিলিগুড়ি ও মহানন্দা বাঁচাও আন্দোলন কমিটি, শিলিগুড়ি পরিবেশ বাঁচাও কমিটি এবং অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব সংস্থাগুলিও মহানন্দার ভয়াবহ অবস্থার কথা বলেছে বিভিন্ন সময়ে।

কিছুদিন আগে সবুজ উদ্যোগে গঠিত রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রথম নদী ও জলাভূমি বাঁচাও কনভেনশন শিলিগুড়িতে হয়েছিল। সেখানেও উঠে এসেছিল মহানন্দার সমস্যা ও সমাধানের কথা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ চিন্তক নব দত্ত, শশাঙ্ক দেব, বিবর্তন ভট্টাচার্য, অনিমেষ বসু, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ নাগ, পার্থ চৌধুরী প্রমুখ। পরে স্মারকলিপি দেওয়া হল শিলিগুড়ি পুর

আক্ষরিক অর্থেই নদী দুটি ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। নদীর বুকে গাছের জঙ্গল। ইউট্রোফিকেশন কোথাও কোথাও সাকসেশনও হয়ে গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে দীর্ণ এই নদী। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এই দুই নদী তীরবর্তী জনবসতিগুলোতে কুয়ো, নলকূপ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত জল বের হচ্ছে।

কর্পোরেশনের মেয়র ও আঞ্চলিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে। আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও কিছু হয় নি।

শিলিগুড়ি শহরের জন্য অপরিহার্য ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি:

এতক্ষণ মহানন্দা নিয়ে আলোকপাত করলেও এবার আরেকটি গভীর বিষয়ে প্রবেশ করছি। মহানন্দা তাও শিলিগুড়ির এক অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ফুলেশ্বরী- জোড়াপানি বইছে শহরের মধ্য দিয়ে। যাকে বলে একেবারে বুকের ভেতর দিয়ে। কিন্তু কী অবস্থা নদীগুলির? এককথায় নালায় পরিণত হয়েছে। ঘন কালো জল। আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ফুলেশ্বরী বাজারের কাছে, সূর্যসেন কলোনীতে যদি এই নদীগুলিকে দেখা যায় তাহলে বোঝা যায় এই নদী দুটির বর্তমান অবস্থা কী? আক্ষরিক অর্থেই নদী দুটি ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। নদীর বুকে গাছের জঙ্গল। ইউট্রোফিকেশন কোথাও কোথাও সাকসেশনও হয়ে গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে দীর্ণ এই নদী। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এই দুই নদী তীরবর্তী জনবসতিগুলোতে কুয়ো, নলকূপ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত জল বের হচ্ছে। অর্থাৎ নদী দূষণের চূড়ান্ত জায়গায় পৌছে গিয়েছে ফুলেশ্বরী আর জোড়াপানি। কোনও কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এর থেকে বাঁচতে?

২০০২ সালে ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীদূষণ মোকাবিলায় পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তিনটি এসটিপি বা সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর কথা হয়। এর চার বছর বাদে ২০০৬ সালে ২ টিএসটিপির জন্য জমি মেলে। এসজেডিএ সূত্রেই জানা গিয়েছিল যে, শহরের যাবতীয় জঞ্জাল মিশ্রিত জল কয়েক দফায় পরিশ্রুত করা হবে। প্রথমে ডাবের খোলা, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, থার্মোকল জাতীয় আবর্জনা ছেঁকে ফেলা হবে। সেই জলও দ্বিতীয় দফায় পরিশ্রুত করে যতটা সম্ভব জীবাণুমুক্ত করা হবে। তৃতীয় দফায় পরিশোধনের পর জল ফেলা হবে নদীতে। কিন্তু ২০২০ সালের ২০ মার্চ অবধি সেখানে কিছুই হয় নি। সে প্রকল্প বিশবাঁও জলে। অথচ নদীবক্ষ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। অবরুদ্ধ

সাহু নদীর ধারে আলোচনাসভা

হয়ে যাচ্ছে ফুলেশ্বরী-জোড়াপানির গতিপথ। নদীর জায়গা দখল করার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। অল্প বৃষ্টিতেই পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হবে। নদীর নিজস্ব জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে। একটি বিশালকায় বিপর্যয়ের মুখে ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি। স্বাভাবিকভাবেই শিলিগুড়ি শহরও সঙ্কটের মুখে। অথচ সামান্য দু একটি উদ্যোগ ছাড়া কারও কোনও হেলদোল নেই।

কী অবস্থা সাহু নদীর?

শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন আরেকটি নদী হল সাহু। কেমন আছে সে? কিছুদিন আগে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল "পুরনিগমের চোখ মহানন্দার বিসর্জনে। দূষিত হয়ে স্রোতহীন সাহু"। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে রাজ্যস্তরীয় একটি আলোচনাসভায় বক্তা হিসেবে থাকার সুযোগ হয়েছিল। কিন্ত আমার শর্ত ছিল আলোচনাসভা কোনও ঘরে নয় প্রকৃতিতে করতে হবে। মেনে নিয়েছিলেন উদ্যোক্তা অধ্যাপক ডঃ প্রবীর কুন্ডু। তিনি আয়োজন করেছিলেন সাহু নদীর ধারে। অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন কলেজ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী- গবেষকরা। তখনই কাছ দেখেছিলাম সাহু নদীকে। তার আগেও একবার সাহু নদী পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম প্রবীরবাবুর সাথে। সাহু নদীর ভাঙন, গতিপথ পরিবর্তন, নাব্যতা হীনতা, দূষণ কিছুই চোখ এড়ায় নি। নদী ব্যবস্থাপনায় প্রায়ই অবহেলা করা হয় সাহু নদীকে। এই উদাসীনতা মিটবে কবে??

আর শুধু তো এই নদীগুলি নয়। বালাসন, পঞ্চনই, মহিষমারি, চামটা এইসব ছোট- বড় নদীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দিতে হবে।

শুধুই কি হতাশা? নাকি আশাও আছে:

না শুধু হতাশা নয়, আশাও আছে। রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি লাগাতার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, নদী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতর, বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বারবার এই বিষয়ে সচেতন করছে। উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিতে পথ দেখাচ্ছে। তাদের আয়োজিত প্রথম উত্তরবঙ্গ নদী ও জলাভূমি বাঁচাও কনভেনশনে শপথ নিয়েছে শিলিগুড়ি পরিবেশ বাঁচাও কমিটি সহ অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব সংস্থাগুলি। সেখানে উপস্থিত ছিল বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দ্বারা আয়োজিত সেই আলোচনাতেও শপথ নিয়েছিল শিক্ষার্থীরা নদী পরিষ্কার রাখার, নদী ভাল রাখার। প্রশাসন, সরকারও এই দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন তাই বলতেই পারি অন্ধকার গভীর ঠিকই কিন্ত আশার আলোও আছে।

‘উত্তরাধিকার’ সন্ধানে আজকের গয়েরকাটায়

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?

শৌভিক রায়

“শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য কদিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মত ছিল। চাপ চাপ কুয়াশার দঙ্গল বাদশাহী মেজাজে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের ওপর দিয়ে খুঁটিমারির জঙ্গলের দিকে। বিচ্ছিরি মন খারাপ করে দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মতটেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাঁতসেঁতে বিকেল-ঘষা সেলেটের মত হয়েছিল সারাদিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সুচের ডগায় বসে থাকত এই পাহাড়ী জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।”

চল্লিশ বছর আগে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে এভাবেই শুরু হয়েছিল এক কালজয়ী উপন্যাস। লেখক স্বয়ং বলেছিলেন, “যেহেতু এই উপন্যাসের পটভূমিকা জলপাইগুড়ি শহর ও ডুয়ার্সের চা-বাগান, তাই দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কেউ কেউ এর চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে পরিচিত চেহারা খুঁজে পেয়েছেন।” উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আজও পাঠক জলপাইগুড়ির অনেক জায়গাকে চিনে ফেললেও ডুয়ার্সের চা-বাগানটিকে কিন্তু চিনতে পারেন না। অথচ সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’ উপন্যাসটি শুরুই হয়েছিল ডুয়ার্সের এই চা-বাগানটি থেকে।

লেখক সমরেশ মজুমদার কোনোদিন কোথাও দাবি করেন নি যে, ‘উত্তরাধিকার’-এ তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বরং বলেছেন যে, “যদিও দুর্ঘটনারা দল বেঁধে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দুর্ঘটনাই। আমি একটা বিশেষ সময় নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেয়েছি, ফটোগ্রাফারের এলেম আমার নেই। কিন্তু কে না জানে যে, একটি মহৎ নির্মাণ দাঁড়িয়ে থাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা ও ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশেই শেষ পর্যন্ত নির্মাণটি সমাপ্ত হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ‘উত্তরাধিকার’ উপন্যাসটির মধ্যেও এমন কিছু উপাদান রয়েছে যার রীতিমত বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, সেই বাস্তবকে খুঁজতে গিয়েও কল্পনার দরকার হয়। কেননা ‘উত্তরাধিকার’

প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে চার দশক আগে অর্থাৎ লেখক সমরেশ মজুমদারের ৩৫ বছর বয়সে (সমরেশ মজুমদারের জন্ম হয় ১৯৪৪ সালে)। উপন্যাসে বিবৃত অনিমেষের ছোটবেলার ঘটনা লেখক বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়ে বর্ণনা করলে, উপন্যাসের সময়কাল পিছিয়ে যাচ্ছে আরও বছর পঁচিশ-তিরিশ, অর্থাৎ সব মিলে প্রায় পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগে। খুব স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের কোনো চরিত্র বাস্তবে যদি সত্যি থেকে থাকে, কালের নিয়মে আজ আর তার না থাকবারই কথা। যে পটভূমিতে উপন্যাসের শুরু হয়েছিল, বদলে যাওয়ার কথা সে জায়গাটিরও।

সত্যি বদলে গেছে সে জায়গা। কিন্তু সেই বদলের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু আভাষ, যা থেকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায় স্বর্গছেঁড়া চা-বাগান, আঙরাভাসা নদী, খুঁটিমারির জঙ্গল কিংবা 'কোন কর্মের না' সেই তালগাছ। এই খুঁজতে গিয়ে খুব বেশি সন্ধানী চোখের দরকার হয় না। আসলে সমরেশ মজুমদার জন্মেছিলেন গয়েরকাটা চা-বাগানের একটি কোয়ার্টারে। ডুয়ার্সের ছোট্ট জনপদ গয়েরকাটার গা লাগোয়া এই সুন্দর চা-বাগানটির পেছনে খুঁটিমারির জঙ্গল আর খানিকটা দূরে বয়ে চলেছে আঙরাভাসা নদী। বাগানের সামনে দিয়ে জাতীয় সড়ক একদিকে ধূপগুড়ি হয়ে শিলিগুড়িগামী আর অন্যদিকে বীরপাড়া-মাদারিহাট হয়ে প্রতিবেশী রাজ্য আসামের দিকে চলে গেছে। ডুয়ার্সের আর পাঁচটি জনপদের মতো ছোট্ট, ছিমছাম কসমোপলিটান গয়েরকাটা থেকে আঠারো ডুয়ার্সের অন্যতম চামুর্চি বা সামসি খুব কাছেই। নিজস্ব চরিত্রে গয়েরকাটা আজও জনজাতি, খুঁটিমারির জঙ্গল, মধুবনী পার্ক, চা-বাগান, শতাব্দী-প্রাচীন গ্রন্থাগার ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গা।

অনেকে মনে করেন যে, গয়েরকাটা জায়গাটির নামকরণের পেছনে 'খয়ের' কথাটির অবদান রয়েছে। খয়ের গাছের আধিক্য হেতু 'খয়ের' লোকমুখেগয়ের হয়ে থাকতে পারে। আবার হাতির গর্তে বা খোট্টায় পড়ে যাওয়া থেকেও নামটি আসতে পারে। 'গৈর' অর্থে হাতিকে বোঝানো হচ্ছে। আবার প্রচলিত আর একটি মত হল যে, এখানে গারো সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করতেন। তারা গ্রামকে 'খোটা' বলতেন। সেখান থেকেও গয়েরকাটা শব্দটি এসে থাকবে। নামকরণের পেছনে যে ইতিহাসই থাকুক, একথা বলবার

এখনও এই ধরনের বাড়ি গয়েরকাটায় দেখা যায়

অপেক্ষা রাখে না যে এই জনপদটি যথেষ্ট প্রাচীন এবং ডুয়ার্সে চা-বাগান বিস্তারের সঙ্গে গয়েরকাটা গড়ে ওঠে। আসলে ১৮৭৪ সালে যখন ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে, ডুয়ার্সে চা-শিল্পের প্রসার ঘটতে পারে, তখন থেকে এখানে একে একে চা-বাগান তৈরি হয় ও সেই চা-বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন জনপদ। সম্ভবত গয়েরকাটাও সেই সময়ে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে এই জায়গাটিও ডুয়ার্সের আর পাঁচটি জায়গার মত

বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী বিকাশ দাসের সঙ্গে গয়েরকাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে লেখক সমরেশ মজুমদার।

ছোটনাগপুর ও নেপাল থেকে আসা জনজাতির শ্রমিক, চা-বাগানে কাজ করতে আসা বাঙালি কেরানি তথা বাবু সম্প্রদায় ও মুনাফালোভী ইংরেজদের নিজস্ব জায়গায় পরিণত হয়। আজও শুধু ইংরেজদের বাদ দিয়ে বাকি সকলেই মজুদ। দেশভাগের পর ওপার থেকে আসা মানুষজন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালেও ডুয়ার্সের মূল চরিত্র কিন্তু এখনও বর্তমান এই ছোট্ট জনপদে। আধুনিক বাড়িঘরের পাশাপাশি দেখা যায় পুরোনো দিনের কাঠের দোতলা বাড়ি যা ডুয়ার্সের নিজস্ব ট্রেড মার্ক ও বিলুপ্তপ্রায়।

সে আমলে গয়েরকাটা কীরকম ছিল সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বোঝাই যাচ্ছে যে, আরণ্যক পরিবেশের ছোট্ট জনপদটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। পরিবেশ দূষণের মাত্রা তখনও সীমা ছাড়ায় নি বলে চামুর্চি বা সামসির পাহাড় ঝকঝক করে উত্তর আকাশে। এখানে একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, ডুয়ার্স শব্দটি এসেছে 'দুয়ার' বা ইংরেজি door থেকে। অতীতে ভুটান থেকে সমতলে আসবার জন্য মোট আঠারোটি গিরিপথ ব্যবহৃত হত, যার এগারোটি ছিল বঙ্গদেশে ও বাকি সাতটি ছিল আসামে। সে সময়, খুঁটিমারির জঙ্গলও আজকের মত এত পাতলা হয়ে যায় নি। সারা বছর

এই কোয়ার্টারে জন্মেছিলেন লেখক সমরেশ মজুমদার

ডুয়ার্সের হালকা ঠান্ডা আর প্রায় ছয় মাস বৃষ্টি মিলিয়ে যায় নি বর্তমান সময়ের মত। চারদিকের সবুজে কংক্রিটের জঙ্গল ছিল কল্পনাতীত। এরকম সময়ে, চা-বাগানের ছোট্ট কোয়ার্টারে বড় হয়ে ওঠা আগামীর এক লেখককে, এই পরিবেশ যে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে সে আর নতুন কী! 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে।

আধুনিক জীবনের বিনোদনের নানা উপকরণহীন সেই চা-বাগান আর তার সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠা এক কিশোরের (উপন্যাসে যার নাম অনিমেষ) মনে এই উদার পরিবেশ, সবুজ চা-বাগান, জনজাতির সরল সাদাসিধে মানুষেরা ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল। তাই পরবর্তীতে জেলা শহর জলপাইগুড়ি বা মহানগর কলকাতাতেও অনিমেষের জীবনে বারবার উঁকি দিয়ে গেছে স্বর্গছেঁড়ার সেই অমলিন দিনগুলি। আর যতবার এমনটা হয়েছে, অনিমেষ যেন এক টাটকা বাতাস নিয়ে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিজস্ব যাপনে। আসলে উত্তরের গয়েরকাটার মাটি ও পরিবেশটাই বোধহয় এমন যে, ভাবনা মাত্রই শরীর ও মন চনমনে হয়ে উঠতে বাধ্য।

গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার পথে, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে, ডানহাতে, গয়েরকাটা চা-বাগানের মুখে কিছু কোয়ার্টার এখনও রয়েছে। এই কোয়ার্টারগুলির একটি চা-বাগানের বর্তমান বড়বাবু জয়দীপ তলাপাত্রের। এই কোয়ার্টারেই জন্মেছিলেন লেখক সমরেশ মজুমদার। এখন থেকেই তিনি চতুর্থ শ্রেণীর পর জলপাইগুড়ি চলে যান। কিন্তু নিজের মাটিকে ভুলতে পারেন নি বলে মাঝেমাঝে এসে থেকে যান এখনও।" এই বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছপালা আজ কমে এসেছে, কিন্তু কোয়ার্টারের "উঠোনের শেষে গোয়ালঘরে যাবার খিড়কি দরজার গায়ে যে তালগাছটা, যার ফল কোনোদিন পাকে নি, ছোট ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন, তা আজও দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে অবশ্য গোয়ালঘর আজ

মধুবনী ব্রিজ

বিদায় নিয়েছে। কোয়ার্টারের সামনের একফালি মাঠ কিন্তু এখনও একইরকম। মাঠের মাঝে থাকা পাকা মণ্ডপে দুর্গা পুজো হয় এখনও। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে, মহীতোষ রেডিও কিনে আলাদা স্পিকার ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে আর রাস্তা জুড়ে বসে 'মদেসিয়া কুলিকামিন' ভিড় করে অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনত। সকালে চা-বাগানে ভোঁ বাজলে বাবুরা সব সাইকেল চেপে কাজে যেতেন। আর ৪৫ বছর আগে যখন সরিৎশেখর যখন কাজ নিয়ে স্বর্গছেঁড়ায় এসেছিলেন তখন "আসাম রোডে সন্ধে হলেই বাঘ ডাকত। চা-বাগান বললে ভুল বলা হবে, তখন তো সবে চা-গাছ লাগানো হচ্ছে। তিনকড়ি মণ্ডল কুলি নিয়ে আসছে রাঁচি থেকে। স্বর্গছেঁড়ার তিন রাস্তার মোড়ে চা-বিড়ি সিগারেটের কোনও দোকান ছিল না তখন। আর আজ বেশ রমরমা চারধার। তিল তিল করে জায়গাটা শহুরে শহুরে হয়ে গেল"। মজা হল এটাই যে, বদলে গেছে এই চিত্রও। আজ চা-বাগান কোয়ার্টারে গরমের জন্য এসি মেশিন বসেছে। সাইকেলের জায়গা নিয়েছে মোটরসাইকেল। বাঘের দেখা পাওয়া আজ অলীক কল্পনা। রেডিও নিজেই জাদুঘরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহুরে শহুরে নয় আর স্বর্গছেঁড়া তথা গয়েরকাটা। পুরোদস্তুর শহর হয়ে গেছে ছোট্ট জনপদটি বিশ্বায়নের এই যুগে।

'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে লেখক লিখছেন যে, চা-বাগান কোয়ার্টারের গোয়ালঘরের পেছনে "বড় বড় জঙ্গলে গাছ আর সেদিক দিয়ে খানিকটা গেলে আঙরাভাসা নদীটি।" অদ্ভুত একটা আঁশটে গন্ধ উঠছে নদীর গা থেকে। চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতের এই নদী চলে গেছে নিচে চা-ফ্যাক্টরির ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরির বিরাট হুইলটা চলছে এর স্রোতে। বলতে গেলে স্বর্গছেঁড়ার হৃদস্পন্দনের মত এই নদীর ঢেউগুলি। কিন্তু এখন আঙরাভাসা আর এত কাছে নেই। বরং ধূপগুড়িমুখী পথে চা-বাগান শেষে বিখ্যাত নদীটির দেখা মেলে। সাহেবি আমল থেকেই আঙরাভাসার মূলস্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়ে চা-বাগানের কারখানায় জল সরবরাহ করা হত। 'উত্তরাধিকার'-এ 'নদী বন্ধ' করবার কথাও রয়েছে। লেখক সমরেশ মজুমদারের ভাই সুদীপ মজুমদার জানালেন যে, এই ব্যবস্থা আজ আর নেই। কেননা আশি-একাশি সালের বন্যায় নদী নিজেই তার মূলস্রোতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। চা-বাগানের তদানীন্তন ম্যানেজার সাহেব চেষ্টা করেও নদীকে বাগানের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি।

আজ নদী বাগানের প্রান্তে। দেখা যায় না 'উত্তরাধিকার'-এ বর্ণিত সেই দৃশ্যও— "প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা আঙরাভাসার পাড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল অনির। পুরো নদীটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, সেই ধোপার ঘাট পর্যন্ত, অজস্র হ্যারিকেন আর টর্চের আলো জোনাকির মত নাচছে। আচমকা দেখলে মনে হয় যেন দেওয়ালির রাতটাকে কে উপুড় করে দিয়েছে নদীতে। সমস্ত কুলি লাইন ভেঙ্গে পড়েছে এখানে। আঙরাভাসার দিকে তাকিয়ে কেমন বিশ্রী লাগল অনির। জল এখন পায়ের তলায়। কাপড়কাচা পাথরটা ভেজা নুড়ির ওপর পড়ে আছে। জল মাঝখানে। তাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঝাড়িকাকু। একটা বিরাট বানমাছ ঠিক সামনেটায় খলবল করছিল। একটা মদেসিয়া মেয়ে মাছটার দিকে এগোবার আগেই ঝাড়িকাকু বাঁ হাতে সেটাকে তুলে খলুইতে ঢুকিয়ে নিল।"

সত্যি বলতে এই ছোট্ট নদীটি উত্তরবঙ্গের বহু নদীর মত অখ্যাত হয়েই থাকত যদি না 'উত্ত রাধিকার' উপন্যাসে তার স্থান না হত। বাংলা সাহিত্যে নদীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বহু বিখ্যাত উপন্যাস নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। আংরাভাসা সে পর্যায়ে না গেলেও এই উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে তার ভূমিকা যে অনস্বীকার্য সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে পথপাশে সরকারি সাইনবোর্ডে 'আংরাভাসা'র পরিবর্তে 'আংড়াভাষা' বানানটি পীড়াদায়ক, যদিও আংড়া নামে কোনো ভাষা আছে কিনা তা জানা

নেই। খুঁটিমারির জঙ্গলকে যেভাবে আমরা উপন্যাসে পেয়েছি সেই পরিবেশ আজ অনেকটাই নেই। উত্তরের বহু অরণ্যের মত খুঁটিমারির সবুজও অনেক অংশে কমে গেছে। কিন্তু এখনও পথচলতি হঠাৎ দেখা পাওয়া যায় ময়ূর বা অন্য পাখির। নাথুয়ার বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমিতা সরকার বোস জানালেন যে, গয়েরকাটা থেকে কর্মক্ষেত্রের পথে হাতিদের পথ অবরোধে বহুবারই হয় বিদ্যালয়ে যেতে পারেন নি অথবা দেরি করেছেন। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, খুঁটিমারির সেই গা ছমছমে ভাবটি অবলুপ্ত। অরণ্যের মাঝ দিয়ে নাথুয়া অবধি সড়কপথে অনবরত গাড়ি চলছে। তুলনায় নাথুয়া চা-বাগান ও বনবস্তি পেরিয়ে ভয়ঙ্কর ডায়ানা নদী ও তার ওপারের ঘন অরণ্য সম্ভ্রম জাগায়।

বদলে যাওয়া এই চেহারা নিয়েও কিন্তু গয়েরকাটা নিজের মত করে সমৃদ্ধ। এই শহরে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন 'রিডিং লাইব্রেরি'। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরিটি নিঃসন্দেহে ডুয়ার্সের এক অনন্য সম্পদ। খারাপ লাগে এই ভেবে যে, সেভাবে এই লাইব্রেরির কোনো প্রচার আজও নেই। অথচ এই লাইব্রেরিটি নিজেই একটি গবেষণার বস্তু হয়ে উঠতে পারে। গয়েরকাটা বয়েজ ও গার্লস হাই স্কুলেরও বয়স কম নয়। অতীতে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হলেও আজ স্কুলদুটি উচ্চ মাধ্যমিকে পরিণত হয়েছে। আগের মত ছাত্র-ছাত্রীদের আর বীরপাড়া বা ধুপগুড়িতে যেতে হয় না। তবে উচ্চ শিক্ষার জন্য এখনও কিন্তু উল্লিখিত জনপদ দুটির ওপরেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভরসা করতে হয়, কেননা এখনও অবধি কলেজ স্থাপিত হয় নি এখানে। তবে খুব কাছের নাথুয়াতে একটি আইটিআই কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কারিগরি শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের খানিকটা অভাব মিটেছে। অতীতের সেই ভাঙাচোরা রাস্তা আর দেখা যায় না। বরং ঝকঝকে কালো পিচের জাতীয় সড়কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাকি রাস্তাগুলিও ছিমছাম, সুন্দর। মধুবনী পার্কটিও আজকের গয়েরকাটার অন্য আকর্ষণ। নদীর ধরে পরিচ্ছন্ন পার্কটিতে ভিড় জমান অনেকেই। উল্টোদিকে গয়েরকাটা চা-বাগানের ডিভিশন এলাকা পার্কের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। নদীর ওপর ব্রিটিশ আমলের পুরোনো ব্রিজটির পাশে নতুন ব্রিজ উঠেছে। আজও মধুবনী ব্রিজ নামে পরিচিত। ব্রিজটি কেন লেখক সমরেশ মজুমদার বা তাঁর কোনো সৃষ্টির সঙ্গে জুড়ে যাবে না সে প্রশ্ন কিন্তু তোলেন পাঠকদের অনেকেই। তেমনই অনেকে মনে করেন যে, চা-বাগানের যে কোয়ার্টারে সমরেশ মজুমদার জন্মেছিলেন ও বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন এবং যে কোয়ার্টারের প্রকারন্তরে 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে পাওয়া যায় তাও সংরক্ষণ করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে যে, কোয়ার্টারটি কিন্তু এখনও গয়েরকাটা চা-বাগানের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই একটি উপন্যাস শুধু যে গয়েরকাটাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করেছে বললে বোধহয় ভুল বলা হবে। আসলে ডুয়ার্সের বেশিরভাগ জনপদের চরিত্র গয়েরকাটার মত। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগান ডুয়ার্সের সব কয়টি চা-বাগানের প্রতিনিধি যেন। আর অনি তো সকল যুগে সকল দেশে থাকা সেই কিশোরটি যার চোখে স্বপ্নের অঞ্জন থাকে সবকিছু বদলে দেওয়ার। পরিহাসটা এখানেই যে, সময়ের সঙ্গে আমাদের বাহ্যিক আবরণ বদলে গেলেও, গ্রাম বা শহরের আমূল বদল হলেও, বদলায় না অপু বা অনির মত কিশোরেরা। তারা আমাদের সকলের মাঝে সারা জীবন ধরে রয়ে যায়। আমাদের বয়স যত বাড়ে তত আমরা খুঁজে ফিরি নিজেদের মধ্যে থাকা সেই কিশোরটিকে। নিজের সন্তানের মধ্যে অনেকসময় আমরা সেই কিশোরকে দেখি, যেভাবে বয়স্ক অনিমেষ তার সন্তান অর্কের মধ্যে নিজের ছায়া দেখেছিল পরবর্তীতে। ভাবতে ভাল লেগে যে, একটি মহৎ নির্মাণের পেছনে উত্তরের শান্ত সুন্দর একটি ছোট্ট জনপদ তার চিহ্ন রেখেছে। সময়ের সঙ্গে তার নিজের চেহারার পরিবর্তন এলেও, আজও সে 'উত্তরাধিকার'-এর সেই ছোট্ট জায়গাটি, যেন সত্যিই স্বর্গ থেকে ছিঁড়ে আনা।

ধারাবাহিক উপন্যাস। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব

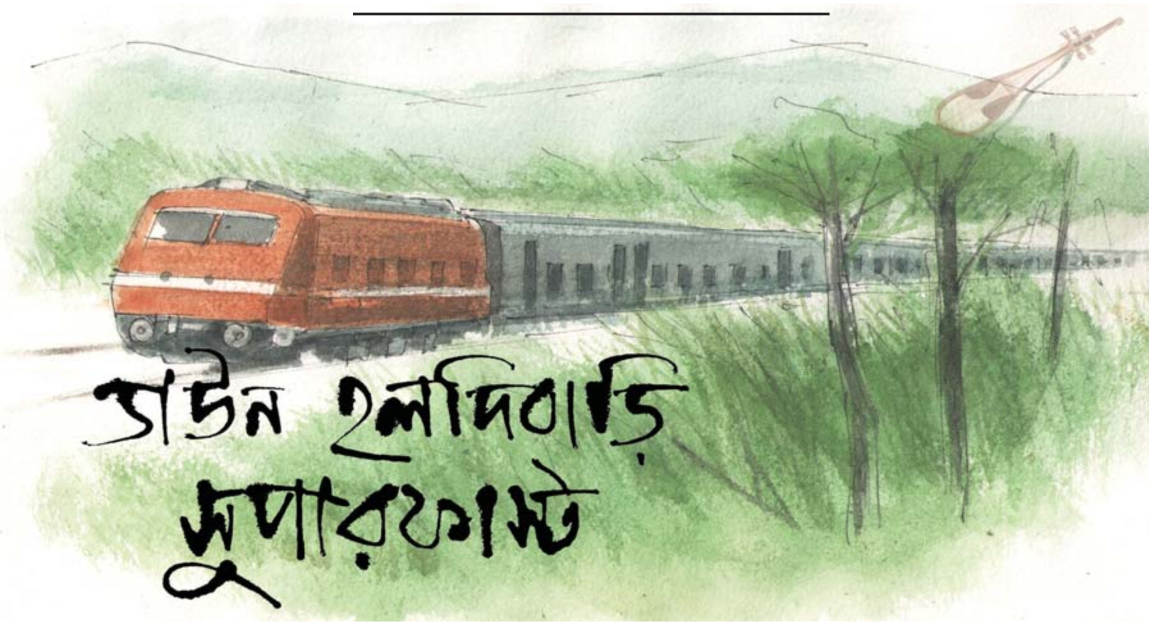

সুজিত দাস

মধুপুর স্টেশনে নামা চরিত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য সূত্রে। তারপর অতীতে চলে গেল হলদিবাড়ি সুপার ফাস্ট। প্রায় ৪৫ বছর আগের আমিন এল গল্পে। তার স্ত্রীর রহস্যময় গর্ভসঞ্চার। অতীত থেকে আমিনকে বর্তমানে নিয়ে আসে সময়ের ট্রেন। আমিনের বাঁশি আর শ্যামসুন্দরের দোতারার ভিডিও রেকর্ডিং কেন তোলা হলো? মধুপুরে পার্টি দিচ্ছে ইলা। এখানে দেখানো হবে ভিডিও? আমিনের ভিডিও নিয়ে মাতামাতির পেছনে কি সত্যি সংস্কৃতির প্রতি প্রেম? নাকি রচিত হচ্ছে ষড়যন্ত্রের বাসর ঘর? গল্প কর্ড লাইন ছেড়ে টান টান মেইন লাইনে।

৭।

সব পুলিশ অফিসের সামনে সেমিকোলনের মত একটা রুদ্রপলাশ গাছ থাকে। খাকির বিপ্রতীপে লাল ফুল। তাও বসন্তকালে। কী অদ্ভুত প্যারাডক্স! রেডিওট্রান্সমিশন, ভারি বুট আর পাইলট কারের আশেপাশে রুদ্রপলাশ। ভাবা যায়? এসডিপিও অফিসের সামনেও এমনই এক বেমক্কা রুদ্রপলাশ। তার ওপর এই ষড়যন্ত্রের চৈত্র। বসন্তকালে গুলাল ওড়ে, কোকিল ডাকে পাগলের মত।তাই বলে পুরুষ কোকিলটি এভাবে ডাকবে এখন! এখন নতুন এসডিপিও সাহেবের চেম্বারে সিক্রেট মিটিং। বাইরে লাল আলো। তবু এই হাইফেনের মত

কোকিল, সেমিকোলনের মত রুদ্রপলাশ। চৈত্র এমনই একষড়যন্ত্রের মাস। রাস্তায় আবিরের দাগ। পুলিশ অফিসে কোকিল। খাকির উল্টোদিকেই এক পেলব ক্যানভাস।

বাতাস এই ঠাণ্ডা তো এই উষ্ণ। নতুন এসডিপিও সাহেবের চেম্বারে এসি চলছে হালকা। সৌরভ দত্ত একদিকে। সামনে মহকুমার দুঁদে অফিসারেরা। ট্রেনিং-এর পরেই সৌরভ বুঝে গেছে ইট'স আ চেইন অফ হায়ারার্কি। কিন্তু ফুট সোলজাররাই আসল। ওঁরাই ছিঁচকে চোরদের চেনে, ইনফর্মার পোষে এবং লক আপে মা-বহেন করে পেটের ভেতর থেকে কথা বের করে আনে। থানার ছোটবাবু, মেজবাবু আর বড়বাবুরাই ধুলোর কাছাকাছি। কাঁচা খবর ওখানেই থাকে। ইনটেলিজেন্সের মেসেজ খানিকটা সেই অবাধ্য প্রেমিকার মত। হাতে পেলেও বুঝে উঠতে উঠতে দিন শেষ। রাতও। লা-ওপালার পেয়ালায় আট কাপ চা আসে। সৌরভ বাকি অফিসারদের ইঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিতে বলে এবং সরাসরি মূল বিষয়ে আসে,

'সি, অফিসার্স, উই হ্যাভ রিসিভড আ ভেরি ক্রিপটিক ইনটেল'।

সামনের সারির বাঁদিকে বসে ডিএসপি, ডি আইবি মিলন গোম্বু। থিন অ্যারারুট চায়ে ডুবিয়ে নরম করছিলেন। এতই মগ্ন ছিলেন সাহেবের কথায় বিস্কুট ঠিক সময়ে চায়ের পেয়ালা থেকে তোলার আগেই ডুবে গেল। অপ্রস্তুত গোম্বু একজন পোড়খাওয়া অফিসার। এলাকা হাতের তালুর মত চেনেন। প্রতিটা বীটে নিজস্ব ইনফর্মার। নিঃশব্দ একটা লম্বা চুমুকের পর বলে উঠলেন,

'মেসেজটা শেয়ার করা যাবে, স্যর?'

'অবভিয়াসলি। গতকাল সেন্ট্রাল আইবি থেকে একটা সিঙ্গল লাইনার এসেছে', সৌরভ বলেন, 'রাঙ্গাপানি নিডস্ অ্যাটেনশন, সামথিং অরেঞ্জ ইজ লাইকলি টু হ্যাপেন'।

'অরেঞ্জ?', গোম্বু দ্বিতীয় বিস্কুটটা হাতেই ধরে রাখেন। চায়ে ডোবানোর ঠিক আগে। 'হাউ কাম, স্যর? অরেঞ্জ সিমস্ টু বি আ রেড হেরিং'।

'দ্যাটস্ দ্য পয়েন্ট, মিস্টার গোম্বু, উই মাস্ট জিরো ইন। রাঙ্গাপানিতে বড় ইন্সটলেশন কোনগুলো?'

'স্যর, দুটো স্কুল, বিডি অফিস, একটা চা-বাগান উইথ প্রসেসিং ইউনিট, একটা ক্যান্সার হসপিটাল, দু-একটা ছোটখাটো কারখানা। অ্যান্ড, মোস্ট ইম্পর্টান্টলি, একটা বিএসএফ ইউনিট।'

'বি এস এফ-এর ইউনিট কমান্ডার মিস্টার আহুজার সঙ্গে কথা বলেছি', সৌরভ বলে ওঠেন,'দে হ্যাভ গট নো সাচ ইনটেল। উই মাস্ট পিনপয়েন্ট, ডিএসপি সাহেব। তাছাড়া এই খবর পাওয়ার পরে আহুজা সাহেব অতিরিক্ত প্রোটেকশন নিজেই অ্যারেঞ্জ করে নেবেন। বিএসএফ-এর সেই কুইক রেসপন্স আছে।'

'স্যর, গিভ মি অ্যাটলিস্ট আ কাপল অফ আওয়ারস। শ্যাল মিট আফটার লাঞ্চ।'

'ইয়াপ, ডান। অ্যাট ফিফটিন জিরো জিরো আওয়ারস। শার্প।'

রাঙ্গাপানির ম্যাপ টেবিলে ফেলে পাঁচজন আইসি এবং মিলন গোম্বু একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

'স্যর, নরমাল মেসেজ প্যাটার্নে অরেঞ্জ মানে তো আগুন', ভক্তিনগর থানার আইসি গোম্বুর দিকে তাকায় উত্তরের আশায়।

'হাঁ, বহেনচো, তু তো বড়া তিস মার খান নিকলা। এখানে অরেঞ্জ যে রেড হেরিং নয়, তেরে কো ক্যায়সে মালুম?'

সকলেই জানে মিলন গোম্বুর মুখ এরকমই। এও জানে ডিএসপি সাহেবই শিক্ষাগুরু। বিপদে আপদে প্রোটেকশন দেওয়ার মানুষ এই একজনই। হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন সকলকে। গুরু মানে সকলে। সাহেবের মুখ না চললে বুঝে নিতে হবে ওঁর মন ভাল নেই।

'আগ তো জরুর, লেকিন কোন সা কোঅর্ডিনেট?' ছোট চোখ কুঁচকে আরো ছোট হয় মিলন গোম্বুর। 'সোচো, আউর ধ্যান সে সোচো।

সারে খবরিলালকে অ্যাকটিভেট করো। টাইম ইজ প্রেশাস।'

নিজের চেম্বারে বসে আকাশপাতাল ভাবতে থাকেন মিলন গোম্বু। মংরা যে চিরকুট ওকে লাটাগুড়িতে দিয়েছিল তাতে ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু 'ট্রিপল আর'-এর নেটওয়ার্ক এতটাই নিশ্ছিদ্র যে ডিকোড করাও মুশকিল তাছাড়া গোম্বুকে লজিস্টিক সাপোর্ট ছাড়া আর কিছুতে জড়ানো হয় না। মেসেজের মানে বোঝার চেষ্টা করেন মিলন। আয়নার মত পরিষ্কার, কোনও বড় জায়গায় হিট হবে না। এমন কোনও জায়গা বেছে নেওয়া হবে যেটা নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ আছে। সব থানার সাম্প্রতিক জিডি এন্ট্রিগুলো খতিয়ে দেখে মিলন। এতদিনের অভিজ্ঞতা বলছে ঝড়ের আগে একটা পূর্বাভাস থাকবেই। ছোট হলেও। থানার ডিউটি অফিসারেরা এমনিতেই নানান চাপে থাকে। ভিআইপি ডিউটি, জমি বিবাদ আর বাদবাকি ঝঞ্ঝাট তো আছেই। ডিউটি অফিসারদের জিডি এন্ট্রিও অনেক সময়ই দায়সারা। তবু মিলন পাতা উল্টোতে থাকেন। দু-তিনটে ছোট ঘটনাকে মনে মনে মার্ক করে রাখেন। দেখা যাক থানার আইসি, ওসি আর এসডিপিও সাহেবের কী ডিডাকশন।

ঠিক তিনটেয় আবার সাহেবের চেম্বারে। কোনও টার্গেটকেই 'জিরো ইন' করা অসম্ভব। ঠিক হয় বড় ইন্সটলেশনগুলোতে আর্মড ফোর্স থাকবে আর বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত নাকা চেকিং এবং নাইট প্যাট্রলিং। অনেক সময়ই এরকম 'হোক্স' ইনটেল আসে। খুব বেশি উর্দি মোবিলাইজ করে ফেললে জনমানসে একটা প্যানিক তৈরি হয়। এসডিপিও সাহেব মিলন গোম্বুকে নির্দেশ দিলেন রোস্টার বানানোর। আইসি এবং ওসিদের বললেন আরও অ্যালার্ট থাকতে। সব কাজ শেষ করে অফিস থেকে প্রধাননগরে নিজের বাড়ি ফেরার পথে ইন্দ্রাশিসের কল আসে, ওয়্যাটস অ্যাপে,

'মিলনজি, আকাশের অবস্থা কেমন?'

'ইয়েস মংরা, ক্লিয়ার ব্লু স্কাই। লাগতা হ্যায় বারিষ নেহি হোগা আজ।'

'ওকে মিলনজি, ভোলি কো সূর্যোদয় একদমে রাতো হুনেছ।' কালকে ভোরের সূর্য যখন উঠবে তখন আকাশ যে লাল থাকবে এটা জানেন মিলন গোম্বু।

'গ্লোবাল কেমিক্যালস' প্রায় আট একর জমির ওপর। রাঙ্গাপানির মরুদ্যান যেন। গোটা কারখানাটা টেরাকোটা রঙের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে চার মিটার অন্তর অন্তর ড্রুপিং দেবদারু। প্রাচীরের ওপর থেকে লতিয়ে পড়া বিগনোনিয়া ফুলের গাছ। এলাকার প্রায় ষাট জন মানুষ ওখানে কাজ করে শ্রমিক হিসেবে। ম্যানেজমেন্ট খুব ভাল। কমিউনিটি হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই কোথাও কোনও কার্পণ্য নেই। ফলত, এই কারখানায় কোনও ইউনিয়নও নেই। গ্লোবাল কেমিক্যালস-এ আজ সাজো সাজো রব। কারখানা ইন্সপেকশনে প্রতিনিধি দল আসছে। গ্লোবাল কেমিক্যালস সম্ভবত এক জার্মান কোম্পানির সঙ্গে টাই আপ করতে চলেছে। মালিক কিষাণ শুদ্রানিয়ার টোপাজ ব্লু রঙের মার্সিডিজ অনেক সকাল সকাল ঢুকে গেছে কারখানার চৌহদ্দিতে।

গ্লোবাল কেমিক্যালস-এর মূল ফ্যাকটরি চারতলা। লোহার গ্রিড দিয়ে তৈরি মেঝে। কাচের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিরেকটরস চেম্বারে বসেও ঘামছেন উনি। ঢোকার সময়েও ম্যারাপ বাঁধা মঞ্চে বসে থাকতে দেখেছেন 'নদী বাঁচাও কমিটি'র ছেলেমেয়েগুলোকে। টাইয়ের নটটা আলগা করতে করতে ইন্টারকমে ডেকে পাঠান প্রোডাকশন ম্যানেজার প্রকাশ সানিগ্রাহীকে,

'প্রকাশ, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের রিপোর্ট কেমন এসেছে?'

'একেবারে পারফেক্ট স্যর, লচকা নদীর জলের রিপোর্টে বিওডি ভ্যালু যদিও বেশ হাই ছিল নরমাল রেঞ্জের থেকে। সেটাও ন্যাশনাল কেমিক্যাল টেস্ট

হাউসের চিফ কেমিস্টকে বলে ম্যানেজ করে নিয়েছি। বোথ দ্য রিপোর্টস আর জলি গুড, স্যর।'

'দেন, এই ছেলেমেয়েগুলো কী চায়? পিআরও এতদিনেও কিছু করে উঠতে পারল না?'

'স্যর, উই হ্যাভ ট্রায়েড থ্রু অল পসিবল মিনস বাট ইন ভেইন।'

'লোকাল পার্টি, পুলিশ এমনকী পলিউশন কন্ট্রোল এভরিথিং ইন অর্ডার। এই ছেলেমেয়েগুলোকে তাহলে বাগে আনতে পারছ না কেন?'

ঘরের টেম্পারেচার আরও একটু কমিয়ে ইন্টারকমে নিজের পিএ-কে ডেকে পাঠান শুভ্রানিয়া,

'মিস ছেত্রী, জার্মান টিমটার কখন ল্যান্ড করার কথা?'

'জেট এয়ারওয়েজের ফ্লাইট, স্যর। এগারোটা পঁচিশে বাগডোগরা।'

'গাড়ি ঠিক সময়ে যাতে পৌঁছোয়। হোয়াট অ্যাবাউট মিস্ বিপাসনা মুখার্জি?'

দার্জিলিং মোড়ের কাছে এই হেরিটেজ হোটেলটা অনেক পুরনো। দোতলায় একটা কোণের ঘরে 'গ্লোবাল কেমিক্যালস' ওর থাকার ব্যবস্থা করেছে। জার্মান টিমটাকে বাগডোগরা থেকে নিয়ে রাঙ্গাপানি যেতে হবে। বিপাসনা এই টিমের সঙ্গেই থাকবে সারাদিন, দোভাষী হিসেবে। কাল ভোরে রওনা দেবে সিকিমের দিকে। সকালের যোগাসন শেষ করে রেসিং সাইকেলে চম্পাসারি অবধি গিয়ে ফিরে এসেছে। আজকাল মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বেশ বেড়েছে, একটু ভাল হোটেলেই রেন্টাল রেসিং সাইকেল পাওয়া যায়। কালো স্প্যাগেটি আর কালো প্যাডেলপুশার পরা একটি মেয়েকে এত জোরে সাইক্লিং করতে দেখে ভোরের চায়ের দোকান থেকে কৌতূহল এবং বিস্ময়ের দৃষ্টি উড়ে এসেছে অনেকবার। ফিরে এসে স্নানে যাওয়ার আগে চায়ের অনুরোধ জানায় রুম সার্ভিসে,

'দার্জিলিং টি, সেপারেট।' পাতলা সোনালি তরলে চুমুক দিতে দিতে একটা মেসেজ পাঠায় বিপাসনা,

'গট দ্য লিপস্টিক, হানি। অরেঞ্জ ইন কালার। থ্যাংক্স আ লট।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার ঈষৎ সবুজাভ ম্যাচিং কনট্যাক্ট লেন্সটা পরে নেয় বিপাসনা মুখার্জি। লিনেনের শাড়ি, টারকয়েজ। সঙ্গে স্লিভলেস। প্রায় ক্রু কাট্ চুলের অ্যান্টিক্লাইমাক্স এই পোষাকে নিজেই নিজেকে তারিফ করে মিস্ বিপাসনা মুখার্জি।

দার্জিলিং মোড় থেকে বাগডোগরার রাস্তা মেরে কেটে পঁচিশ মিনিট। কিন্তু মোড়ের মাথার জ্যামটা খুবই ডাইসি। তাই একটু আগেই রওনা দেয় বিপাসনা। ডাইনে উত্তরায়ন। একসময়ের চাঁদমুনি চা-বাগান। সব সবুজ উপড়ে ফেলে তৈরি হওয়া কংক্রিটের এই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকে মিস বিপাসনা মুখার্জি। এই শপিং মল, এই দেশলাই বাক্সের মত ফ্ল্যাটবাড়ি, এই বিরাট বিরাট প্লটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বাংলোগুলো এভাবেই একদিন কেড়ে নেবে পৃথিবীর সব সবুজ, সব গাছ এবং সব পাখি। গালিচার মতো সবুজ একদিন স্কোয়ার ফুট হয়ে যাবে। নদী থেকে হারিয়ে যাবে রূপোর ঝাঁকের মতো নদিয়ালী মাছ। শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রাস্তা এখন পুরো মাখন। শিবমন্দির, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, গোঁসাইপুর পেরিয়ে ঠিক ত্রিশ মিনিট লাগে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে। এখন পৌনে এগারোটা। আরো চল্লিশ মিনিটের অপেক্ষা। ফুড কোর্টে ঢোকে বিপাসনা। একটা এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার করে এয়ারকুলারের পাশের একটা টেবিলে বসে। এই রেস্তোরাঁয় এসি নেই। দূর থেকেই শঙ্কুকে চিনতে পারে ও। কিন্তু এই কন্ট্যাক্ট লেন্স আর ক্রু কাটচুলের বিপাসনার দিকে শঙ্কু অপরিচিতের মত তাকিয়ে থাকে। যাক, মেকওভার নিখুঁত। ক্যানে চুমুক দিতে দিতে হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে বুলিয়ে নেয়। আজকাল মোবাইলেই টুকটাক আয়নার কাজ

সেরে ফেলা যায়। নিজের ঠোঁটের দিকে তাকায় মিস মুখার্জি। অরেঞ্জ।

কার্ল উলফ্‌গ্যাং-কে দেখেই চিনতে পারে বিপাসনা। সাড়ে ছয়ফুট, বিরলকেশ এই ভদলোকের সঙ্গেই কথা হয়েছিল ওর। এখন এই রিসেপশন এরিয়ায় পুরো ছয়জনের টিমটাকে দেখেই এগিয়ে আসে মিস মুখার্জি,

'উইলকোম্মেন ইন বাড্ডোগরা', দুইহাত জোড় করে নমস্কার করে বিপাসনা।

তিনটে গাড়ির ছোট্ট কনভয় নিয়ে গ্লোবাল কেমিক্যালসএর দিকে রওনা দেয় বিপাসনা। কারখানার গেটের পাশেই 'নদী বাঁচাও কমিটি'র ছেলেমেয়েগুলো এখনও ম্যারাপের নিচে বসে। তিনটে গাড়ির কনভয় আসার খবর পেয়েই শুদ্রানিয়া নিজে এবং মিস ছেত্রীসহ একটা দল অভ্যর্থনা করে এই জার্মান প্রতিনিধিদের। 'গ্লোবাল কেমিক্যালস'-এর নিজস্ব গেস্টহাউসে মিনিট কুড়ির একটা ছোট্ট বিশ্রামের পরই কার্ল উলফ্‌গ্যাং গোটা টিম নিয়ে কারখানা ইন্সপেকশনে নেমে পড়ে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে জার্মান দলের কথাবার্তা চলছে বিপাসনার মাধ্যমে। একজন বাদে এই টিমটার কেউই ইংরেজি বিশেষ বলতে ও বুঝতে পারেন না। সারাদিন নানান আলোচনা, নানান ভ্যাট, যন্ত্রপাতি এবং অজস্র লে-আউট দেখার পর এখন কোম্পানির গেস্টহাউসে আসে সবাই। কার্ল উলফ্‌গ্যাং এবং তার টিম মোটামুটি সন্তুষ্ট। এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নিয়ে সামান্য ভ্রূ কোঁচকালেও মোটের ওপর খুশি এই টাকমাথা বৃদ্ধ। সন্ধের মধ্যেই লিগাল ডকুমেন্টে সামান্য ব্রাশ আপ করে ফেলা হবে। সামনের সপ্তাহে শুদ্রানিয়া কলকাতা গিয়ে ফাইনাল মৌ সই করে আসবেন। আজ রাতের দার্জিলিং মেল ধরে ফিরে যাবে এই দলটি। শুদ্রানিয়া বিগলিত মুখে আপ্যায়ন করে চলেছে অতিথিদের। এখনকার এই বিয়ার পানের পর্ব শেষ হলেই এনজেপি স্টেশনে যাবে সকলে মিলে। কার্ল উলফগ্যাং এবং তার টিমকে সি-অফ করার জন্য।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে বিপাসনা যখন হোটেলের ঘরে ফিরে এল, রাত ঠিক নয়টা। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম গিয়েছে। মোবাইলে বার্লিন ফিলহারমনি চালিয়ে ধ্যানে বসে বিপাসনা। আধঘন্টার ধ্যান মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সব মানসিক ক্লান্তি মুছে গেলে একটা লম্বা স্নান সেরে রুম সার্ভিসে রেড ওয়াইন আর একটু ভেজ সতেঁ চায় বিপাসনা। সামান্য লাগেজ সঙ্গে আছে। ওগুলো গুছিয়ে নিতে হবে রাতেই। কাল ভোরে ইয়াকসামের দিকে রওয়ানা। কার্তোক মনাস্টারিতে দু-তিনদিন থাকার কথা ওর। হ্যান্ডব্যাগ গুছোতে গিয়ে মনে মনে হাসে বিপাসনা। নতুন পাওয়া লিপস্টিকটা আর নেই। ভোররাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখে ও। স্বপ্নে একটা লিপস্টিক, একটা কমলা রঙের লিপস্টিক 'সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ' হয়ে চিপকে থাকে দাহ্য রাসায়নিকের ভ্যাটে। লিপস্টিকের ভেতরেই একটা ইনবিল্ট টাইমার। হঠাত মধ্যরাতের আকাশ জুড়ে অজস্র তারাবাতি। আলোর রোশনাই। লচকা নদীর পার বরাবর অনেক পাখির ডাক। এবং প্রায় মরা নদীটির বুকে স্বচ্ছ জল। জলের ভেতর পাহাড়ি মাছ। রুপোর মতো রং সেইসব মাছের।

প্রধাননগরের বাড়ি থেকে যখন বের হলেন মিলন গোম্বু তখন সবে আকাশে রং লেগেছে। একটু আগেই স্পট থেকে ফিরেছেন উনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং প্রাণহানির কোনও খবর নেই। তবে গ্লোবাল কেমিক্যালস আগুন ও বিস্ফোরণে ছারখার। গোম্বু মোবাইল খুলবেন ঠিক সাতটায়। তার আগে বিপাসনা মুখার্জিকে দার্জিলিং মোড়ের হোটেল থেকে তুলে সেভক ব্রিজ অবধি নিজে পৌঁছে দেবেন। সেভক ব্রিজে গাড়ি অপেক্ষায় থাকবে ওঁর জন্য। মাল্লাগুড়িতে তিনটে খবরের কাগজ কিনলেন। নেপালি, বাংলা আর

ইংরেজি। খবরটা দেরিতে এসেছে। তাই কোনও ছবি নেই, লিড নিউজও নেই। শুধু ছোট্ট করে বক্সে দেওয়া একটি খবর। অবশ্য নিউজ পোর্টালগুলোতে ভিডিওসহ খবর আসতে শুরু করেছে। 'ইলেকট্রিক শর্টসার্কিট' থেকে নাকি এই অগ্নিকান্ড। নিজের মনেই হাসেন ডিএসপি ডিআইবি মিলন গোস্বু। হোটেলের রিসেপসনে এসে বিপাসনা মুখার্জিকে খবর দিতে বলেন, গাড়ি এসে গেছে।

এই মুহূর্তে ইয়াকসামের বাতাসে মিহি কুয়াশা। ছবির মত এই পাহাড়ি জনপদে রাত্রি ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। কার্তোক মনাস্টারির ভেতরে বাইরে হিম ঠাণ্ডা। ছোট্ট একটা ঘরের ভেতরে প্রদীপের আলো। ঠাণ্ডা ক্রমশ হাড়ে দাঁত বসিয়ে ফেলছে। ইয়াকের দুধ থেকে বানানো ছুরপি মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করে বিপাসনা মুখার্জি। ঠোঁটে গ্লিসারিন জেল দেওয়ার সময় খুব মিস করতে থাকে ওই অরেঞ্জ লিপস্টিকটাকে। একটু দূরে কোথাও ডেকে ওঠে অসতর্ক নাইটজার। মনাস্টারির এই হিম নিস্তব্ধতায় বড় বেমানান লাগে ওই কর্কশ আওয়াজ। পাহাড়ের খাঁজে এই পাথরের আস্তানায় কোনও মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ট্রলি ব্যাগের লুকনো চেম্বার থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করে বিপাসনা মুখার্জি। মৃদু এবং রিনরিনে স্বরে বলে ওঠে,

'রাধারানী হিয়ার। অরেঞ্জ ইজ দ্য আলটিমেট গ্রিন। থ্যাঙ্ক ইউ সুভাষ, ফর দ্য কিউট লিপস্টিক।'

পিকচার পোস্টকার্ডের মতো মনাস্টারি। ছোট্ট একটি পাথরের ঘর। বাতাসে হিম পড়ার শব্দ। স্লিপিং ব্যাগে ঘুমন্ত এক নিষ্পাপ বালিকা।

বিল্বমঙ্গল রায় ও সুহাসিনী দেবীর আদরের রাধারানী।

রাধারানী রে।

ট্রিপল আর।

৮।

শিলিগুড়ি থেকে চালসা যাওয়ার জন্য সেবকের রাস্তাটাই ভাল। শালুগাড়া পেরোলেই দুপাশে 'আদিম মহা দ্রুম'। করোনেশন ব্রিজে একটা পাথরের বাঘ আছে। আছে কয়েকটা গুমটি দোকান। শশা, বনকুলের দু'একজন ফেরিওয়ালাও। সকালে ট্রেন থেকে নেমে তিনবাত্তি মোড়ের একটা হোটেলে একটু ফ্রেশ হয়েই ওরা দুজন বেরিয়ে পড়েছে এই ভাড়ার টয়োটা ইটিওস গাড়িতে। ওরা মানে আরাত্রিকা আর বলবিন্দর। আরাত্রিকা উনত্রিশ, বলবিন্দর অরোরা সদ্য চল্লিশ। আরাত্রিকা উত্তর কলকাতার কুড়ি ইঞ্চি দেওয়াল, বলবিন্দর ভাতিন্ডার নিট উইথ নো জাঙ্ক। দুজনেই 'দ্য ডেইলি নিউ এজ' পত্রিকার। আরাত্রিকা চিফ রিপোর্টার, বলবিন্দর ফটোগ্রাফার। আজকাল ক্যামেরাপার্সন বলা হচ্ছে যদিও। কয়েকদিন চালসার একটা রিসর্টে থেকেই গোটা এরিয়াটা কভার করে একটা স্টোরি করতে হবে। 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার ব্যুরোতে সকলেই এটা মোটামুটি জেনে গেছে যে কুড়ি ইঞ্চির নিরেট দেওয়ালে বলবিন্দর খানিকটা হলেও সিঁদ কেটে ফেলেছে। নইলে করোনেশন ব্রিজের পাশে চাটাইয়ের গুমটিতে বসে মাইনাস ছয় কাচের ভেতর দিয়ে আরাত্রিকা গুহ কখনোই এমন প্রশ্রয়ের চাউনিতে বলবিন্দরের ভুটানি মদ খাওয়ার এই দৃশ্যটা দেখত না। মিস গুহ, চিফ রিপোর্টার, 'দ্য ডেইলি নিউ এজ', স্টিলের প্লেট থেকে মোমো ট্রাই করত না। কিংবা এই যে পাহাড়ি লঙ্কা, যার ডাকনাম ডল্লে খুরসানি, জিভে ঠেকাত না। অনেক কিছুই করত না হয়ত উনত্রিশের আরাত্রিকা কিন্তু বলবিন্দর ক্রমশ বদলে দিচ্ছে ওর সবকিছু। অথচ কোথাও কোনও জোর নেই, হালকা শিভালরি নেই, চাপিয়ে দেওয়া তো একদমই নেই, তবু। তবু কেন যে একটা অবাধ্য দোয়েল শিস দিতে থাকে মাথার গভীরে।

এই প্রোজেক্টের জন্য 'দ্য ডেইলি নিউ এজ' ওদের সেরা ফোটোগ্রাফারকে পাঞ্জাব থেকে উড়িয়ে এনেছে। তারপর দিনের পর দিন রিসার্চ, কন্ট্যাক্ট পার্সনদের সঙ্গে যোগাযোগ, মোটামুটি মাস দুয়েকের ক্র্যাশ কোর্স-এর পর আজ

সকালে ওরা গ্রাউন্ড জিরোতে। দুটো নিট হুইস্কি শুধুমাত্র ওই ডল্লে খুরসানির চাটনি দিয়ে শেষ করার পর বলবিন্দর মনে করিয়ে দিল আরাত্রিকাকে,

‘হুইস্কি শুড বি উইথ নো জাঙ্ক। নো জাঙ্ক মতলব নো জাঙ্ক। ইট মাস্ট বি নিট।‘

হালকা হেসে ঘড়ির দিকে তাকায় আরাত্রিকা। এইসব ব্যাপার বাদ দিলে মানুষটা অনবদ্য। ক্যামেরায় ম্যাজিক তৈরি করে ফেলতে পারে। বলবিন্দর জানে কোনটা ‘ছবি’ হবে কোনটা হবে না।

ওদলাবাড়ির ঠিক আগে রাস্তার দুপাশে আর্মি ছাউনি। মাঝখান দিয়ে চিরে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে একত্রিশ। যেদিকে তাকাও শুধু শাল আর সেগুন। গাড়ির কাচ নামিয়ে দেয় বলবিন্দর। বনের একটা নিজস্ব ঘ্রাণ আছে। আর আছে কখনও না থামা অবিরাম এক ঝিঁঝিঁ ডাক। গাড়ি থামিয়ে বলবিন্দর চোখের ইশারায় ড্রাইভার ছেলেটিকে বলে বনেট তুলে ইঞ্জিনে কিছু একটা সারানোর ভান করতে। আসলে একটু দূরের একটা সেগুন মঞ্জরির ওপর একজোড়া ধনেশ। নিখুঁত পার্চ। এতক্ষণ ড্রাইভারের পাশের সিটেই বসে ছিল বলবিন্দর। এখন পেছনে এসে আরাত্রিকার পাশে বসে ক্যামেরা বের করে সন্তর্পণে। এই আর্মি এরিয়ায় ফটো তোলা মানা কিন্তু ওই ধনেশ কাপলটিকে লেন্সে ধরতেই হবে। অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় লেন্স চেঞ্জ করে জানালার ভেতর থেকেই শাটার টেপে বলবিন্দর। একবার, দুবার, তিনবার। শেষে বার্সিং মোডে আরও একবার। সেকেন্ডে দশটা শট। তৃপ্ত বলবিন্দরের দিকে তাকায় আরাত্রিকা। নিজের মনেই বিড়বিড় করে, ‘কেমন বসন্ত রাতে ধনেশ পাখির মতন দেখাচ্ছে তার চোখ।’ বলবিন্দর অবাক দৃষ্টিতে তাকাতেই হেসে ফেলে আরাত্রিকা,

‘দিস ইজ নট ইয়োর কাপ অফ টি। একে জীবনানন্দ। তার ওপর ওঁর গদ্য।’

‘ডেইলি নিউ এজ’-এর লোকাল করেস্পন্ডেন্ট এইচ ডি সাহা। রিসর্টের রিসেপসনেই বসে ছিল ওদের রিসিভ করার জন্য। আরাত্রিকা এবং বলবিন্দরকে নিজের নিজের রুমে পৌঁছে দিয়ে আগামি কয়েকদিনের শিডিউল জেনে নেয় ও। আজ বিশ্রাম। কাল থেকে ওঁকে প্রয়োজনমত ডেকে নেওয়া হবে, জানিয়ে দিল আরাত্রিকা। হাউস বলেই দিয়েছে স্টোরি টপ মোস্ট সিক্রেট। এইচডি শুধু এলাকা চেনাবে এবং পলিটিক্যাল লোকেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। নর্থ বেঙ্গলের ইকো ট্যুরিজম আর হোমস্টে নিয়ে ‘দ্য ডেইলি নিউ এজ’ বড় খবর করবে, এটাই এইচডি এবং বাকিরা জানবে। কাল সকালে মাটিয়ালি গ্রামে যেতে হবে। কয়েকটা হোমস্টে আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ‘কোট’ এবং ছবি দুটোই লাগবে। সব শুনেটুনে নিজের মোটরসাইকেল স্টার্ট দেয় এইচডি। মনে মনে ভাবে এই খবর কি ও করতে পারত না? আসলে বড় কাগজের নখরা অনেক। এই গন্ডগ্রামের ট্যুরিজম নিয়ে খবর করার জন্য চিফ রিপোর্টার আর এক্সপোর্টেড ক্যামেরাপার্সন! অবশ্য তাতে ওর কিছু যায় আসে না। স্টোরি প্রতি হাউসের পেমেন্ট বেশ ভাল। টিএ, ডিএ নিয়েও ঝামেলা নেই। তাছাড়া ন্যাশনাল কাগজের প্রেস কার্ড থাকায় অ-নে-ক সুবিধা। খবর হোক না হোক, জেলার সব পার্টিতে বাঁধা নেমন্তন্ন। ধমক চমক তো এক্সট্রা। তাছাড়া রয়্যালটি ছাড়া বালি তুলে তুলে নদীর সাফ করে দেওয়া, স-মিলগুলোর বাড়বাড়ন্ত, ট্রাইবাল জমির কোন চক্করে বেনামি পর্চা, খতিয়ান সবই জানে এইচডি। এও জানে খবর করাটা সহজ। আর খবর না করাটা একটা বিশুদ্ধ আর্ট। তবে কলকাতার রিপোর্টাররা এলে সঙ্গে থেকে এই আয়াগিরি করতে ভাল লাগে না। একবার উত্তরবঙ্গের ধানচাষ নিয়ে এরকমই একজন মডরিপোর্টার দিদিমণি এসেছিল। সঙ্গে বারো পকেটের কার্গো প্যান্ট পরা ক্যামেরাপার্সন, কালো টি-শার্টের বুকে সুমনের গানের লাইন। তো সেই রিপোর্টার দিদিমণি দোমোহানি থেকে ময়নাগুড়ি যাওয়ার রাস্তায়

দুপাশে পাকা ধানের ক্ষেত দেখে এইচ ডিকে জিজ্ঞেস করেছিল,

'এসবই বুঝি পাকা সোনালি রঙের খড় গাছ?'

এদের খুব ভাল করে চেনে এইচডি। মাটির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তবে ভাল ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আছে। জার্নালিজমের। এসব ভাবতে ভাবতেই চালসা মোড় থেকে লাটাগুড়ি হয়ে মধুপুরের রাস্তা ধরে এইচডি।

হরি দাস সাহা, লোকাল করেস্পন্ডেন্ট, 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'।

মাটিয়ালি বাজারে একটাই হার্ডওয়্যার-এর দোকান। মালিক হরেন কুণ্ডু এলাকায় লোকাল পঞ্চায়েতের সর্বেসর্বা। একতলার প্রায় গোটাটা জুড়ে দোকান, ইটের পাঁজা, বালুর স্তূপ আর স্টোন চিপস ঠিক সামনে যে পিডব্লুডির জায়গা, তারই এক কোণে নয়ানজুলির ওপর পাকা পার্টি অফিস। বাড়ির একদিকে বেশ কিছু পিক আপ ভ্যান। গাড়িতে আসতে আসতে এইচডি জানিয়েছে এই নিরীহ পিক আপ ভ্যানগুলো দিনে দোকানের মাল আনা নেওয়া করে, রাতে জিতি বর্ডার দিয়ে ভুটানি মাল। রাস্তা ক্লিয়ার থাকলে সোজা মিরিক, দার্জিলিং কিংবা শালুগাড়া। আরাত্রিকা মৃদু হাসে,

'আপনি তো জানেন এইচডি, আমরা এবারে ইকো ট্যুরিজম আর হোমস্টে নিয়ে কভার করতে এসেছি।'

এইচ ডি-কে দেখে হরেন কুণ্ডু তেমন উৎসাহ দেখায় না। তবে আরাত্রিকা এবং বলবিন্দরের পরিচয় পেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে করজোড়ে অভ্যর্থনা জানান। মুখে স্মিত হাসি,

'আসেন, আসেন। বসেন। তুমিও বোসো সাহা। তা ম্যাড্যামরা কলকাতা থেকে এই এতদূরে? কোনও বড় খবর আছে নাকি?'

'না, না', মিষ্টি হেসে উত্তর দেয় আরাত্রিকা,

'আজকাল সাস্টেইনেবল ট্যুরিজম নিয়ে অনেক আলোচনা। আপনি তো জানেন। সেসব নিয়েই হাউস একটা স্টোরি করতে চায়। সঙ্গে হোমস্টেগুলোর একটু প্রচার। এই আর কী।'

'ওরে কোল্ ড্রিঙ্ক নিয়ে আয় দিদিমণিদের জন্য', হরেন কুণ্ডু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,

'দেখবেনই তো। আপনারা একটু ইয়ে না দিলে লোকে জানবে কী করে? লাস সিজিনে তো পুরো লস গেছে। একটু ছবিটবি দিয়ে ইয়ে দিলে আমাদের টোটাল বুকিং হয়। গরীব মানুষগুলো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। সকলকে নিয়ে চলি বলেই না এই প্রগতিশীল সরকারের ওপর মানুষের এত ভরসা। তা দিদিমণিরা সব দেখেটেখে এই গরীবের বাড়িতেই না হয় দুপুরের ইয়েটা আজ...'

'ব্যস্ত হবেন না হরেনবাবু, আমরা এখানে এক সপ্তাহের মত থাকব। একদিন নিশ্চয়ই দুপুরে আসব আপনার বাড়িতে। এখন একটা ছবি তুলব আপনার, ইনসেটে যাবে', মোক্ষম তির বের করে আরাত্রিকা।

'বটেই তো, বটেই তো। কিন্তু ইয়ে বাসি দাড়ি?'

'তাতে কী যায় আসে?, একটু অগোছালো অবস্থাতেই জনপ্রতিনিধিদের মানায় ভাল', আরাত্রিকা উত্তর দিতে দিতে বলবিন্দরকে ইঙ্গিত করে।

'বেশ বেশ। তবে এই দোকানে না। ওই শিরীষ গাছের নিচে ছবিটা তুললে মনে হয় একটু ইয়ে হবে', হরেনের ফটোগ্রাফিক এবং কমনসেন্সের তুলনা হয় না। বলবিন্দর এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। যা তোলার তুলে নিয়েছে নিঃশব্দে। এখন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির একটা হাফ বাস্ট ছবি। ছবি তোলার পর পাশের পার্টি অফিস থেকে একটা ছেলেকে ওদের সঙ্গে বাইকসহ জুড়ে দেন হরেন,

'ওমাক তামাম হোমস্টেগুলা কনেক দ্যাখে দেক। দেখিস কোনো কাউটাল জ্যানে না হয়। ফম থাকে জ্যান।'

কাউটাল তো দূরের কথা। তেল খাওয়া

মেশিনের মত ছিল ওদের হোমস্টে দর্শন। গরীব মদেশিয়া আর নেপালি পরিবারগুলো বড় যত্নে সাজিয়েছে বাড়ি ঘরদোর। সবাই যেন জানত আজ কেউ আসবে, ছবি তোলা হবে। এইচডি ফেরার পথে আরাত্রিকাকে বলে, 'দেখলেন তো ম্যাডাম, হরেন কুণ্ডু কেমন ঘাঘু। সঙ্গে লোক জুতে দিল। আগে খবর দিয়ে দিল। সব কেমন ছবির মতো ফিটফাট, দেখলেন তো?' আরাত্রিকা উত্তর দেয় না। বরং এইচডিকে রাতে ডিনারে নেমন্তন্ন করে। হরেন কুণ্ডুর ওপর এইচডির এই খারটা জেনুইন। এক্সপ্লোর করতে হবে। তাছাড়া লোকাল করেস্পন্ডেন্টরাই এলাকার সূক্ষ্ম ইকোয়েশন বোঝে ভাল। এখানে কপিবুক জার্নালিজমের স্কোপ নেই।

চালসার এই রিসর্টটা রাতের অন্ধকারে একটা মোহিনী রূপে আচ্ছন্ন থাকে। নিখুঁত ট্রিম করা লন। কেয়ারি করা পথ। দুপাশে হালকা আলো, মাটির তৈরি শেডের নিচে। বিরাট এক সজ্জিত ডাইনিং হল। একটা কচি 'বার'ও আছে। ডিনারের আগেই ওখানে বসেছিল ওরা তিনজন। বলবিন্দর কম কথার মানুষ। মশালা পি-নাটে নয়, ওর মন হুইস্কিতে। এইচডি একটু ধীরে সুস্থে খাচ্ছে। আরাত্রিকার হাতে পাইনঅ্যাপেল জুস। কাচের জানালা দিয়ে ডুয়ার্সের এই মাতাল করা পরিবেশে কেন যে লোকে মদ খায়! এইচডি অনেক খবরাখবর দিতে চাইছে কিন্তু এক্ষুনি ওকে ততটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না আরাত্রিকা। মাঝে ফোন আসে এডিটরের থেকে। কাল 'বাতাস বাংলা' টিভিতে শ্যামসুন্দরের গান আর আমিন মিয়াঁর বাঁশির যুগলবন্দী। লাইভ টেলিকাস্টের সময় বাগজান গ্রামে গিয়ে খবর করতে হবে। ছবিও। ডিনার শেষে আরাত্রিকা এইচডি-কে বলে দেয় সেকথা। নিট পাঁচ পেগের পর গুডনাইট বলার আগে ছয়ফুট এক-এর বলবিন্দর ছোট্ট একটা 'হাগ' করে আরাত্রিকাকে। নিষিদ্ধ তরলের ঝাঁঝালো গন্ধ, ঘাম আর হুগো বস পারফিউমের মারাত্মক ককটেলে মুহূর্তের জন্য গলে যায় আরাত্রিকা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য জেগে ওঠে যুগল বৃন্ত। শিস দিয়ে ওঠে অবাধ্য দোয়েল। কিন্তু ওই মুহূর্তের জন্যই। দুজনের মাঝে একটা গোটা পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে উত্তর কলকাতার কুড়ি ইঞ্চি পুরু ইটের দেওয়াল। ঠাণ্ডা, খুব ঠাণ্ডা।

সিঙ্গীমারির রাস্তা দিয়ে দোমহানি পেরিয়ে যখন বাগজান গ্রামে পৌঁছল আরাত্রিকাদের গাড়ি তখন সন্ধে নেমে এসেছে। বাগজানে আমিন মিয়াঁর বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির তার পৌঁছয় নি। শ্যামসুন্দরদের বাড়িতে টিভি আছে কিন্তু সাদাকালো। শ্যামসুন্দরের মায়ের একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নেয় আরাত্রিকা। বলবিন্দর আক্ষেপ করে আলো নেই বলে। দিনের আলোয় আমিন মিয়াঁর বাড়ির ভিস্যুয়াল নাকি খুব ভাল আসত। এইচডি জানাল দোমোহানিতে মুকুল সাহার বাড়িতে বড় রঙিন টিভি আছে। সেই টিভি 'নিউ নেতাজি সংঘ' মাঠে রাখা হয়েছে। আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরের প্রোগ্রাম দেখবার জন্য 'নিউ নেতাজি সংঘ' মাঠে বেশ ভিড়। ডিএম সাহেব আসতে পারেন নি। ম্যাডাম ডিএম শ্রীমতী আরতিরানি এসেছেন। সামনের সোফায়। 'বাতাস বাংলা' টিভির সঞ্চালক আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরকে টিভিতে পরিচয় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিউ নেতাজি সংঘের সেক্রেটারি শিবু বসুনিয়া মুখের সামনে হাতের মুঠোকে একটা কাল্পনিক মাইক্রোফোন বানিয়ে ভাষণের ঢং-এ চিৎকার করে বলে ওঠেন,

'বন্ধুগণ, আমিন চাচা আরহ শ্যামসুন্দর কেমুন টিভির ভিতিরা সোন্দাইছে দ্যাখেন। তামান দোমোহানি বাসি, তোমরা কনেক জোরে হাততালি দ্যাও। সগায় হাততাতালি দ্যাও। হামার গরব আমিন চাচা জিন্দাবাদ, শ্যামসুন্দর জিন্দাবাদ।'

বলবিন্দর হালকা একটা কনুয়ের খোঁচা দেয় আরাত্রিকাকে,

'হু ইজ দিস নিউ নেতাজি? ইজ দেয়ার এনি আদার সুভাষ বোস হিয়ার?'

শ্যামসুন্দর আর আমিন মিয়াঁকে টিভির স্ক্রিনে দেখে একটা উল্লাসের ধ্বনি ওঠে। শুরু হয় আমিনের বাঁশির ছোট্ট একটু ধুন দিয়ে। এরপর শ্যামসুন্দরের গান আর আমিনের বাঁশি...

'মাটি কাটে, গছও কাটে, মানষিকো দ্যায় কাটি ভাইরে,

মানষিকো দ্যায় কাটি

ইতিহাস কাটি বনায় নিজের নিজের ঘাঁটিরে

উচিত কথা কইলে রে এলা, উমরা, ব্যাজার হয়া জাইবে স্যালা

নদী মোজায়, ডিঘি মোজায়। মোজায় চক্ষুর পানি

বালা সিমেন্ট দিয়া ঢাকে দ্যাশের কাউলানি রে

উচিত কথা কইলে রে এলা, উমরা, ব্যাজার হয়া জাইবে স্যালা

গানোক হানে, নাচোক হানে, ভাষাক হানে বুকোৎ

ভাইরে, ভাষাক হানে বুকোৎ

চাষাক হানে আশাক হানে, মুখা পিন্দি মুখোৎ রে

উচিত কথা কইলে রে এলা, উমরা, ব্যাজার হয়া জাইবে স্যালা'

এই গ্রামে আজ কাবলু বোস আর মুকুল সাহা পাশাপাশি চেয়ারে। এই দোমহানি নামের একটা গ্রাম, তিস্তার পাশে রাতজাগা ছোট্ট একটা গ্রামে আজ অকাল দীপাবলি। কাবলু বোসের ছেলেরা বাদল ঘোষের দোকানের দরবেশ বিলোচ্ছে আর মুকুল সাহার ছেলেরা খুকু দাসের বুন্দিয়া। এ বড় অশৈলী দৃশ্য। আজ লালপুলের পাশের শ্মশানে একটাও মড়া পোড়ে নি, আজ সন্ধেবেলা বন্ধ ছিল উপেন ডাক্তারের চেম্বার। আজ বাতাস বাংলা টিভি একাকার করে দিয়েছে দোমহানির আকাশ, তিস্তার চর। তবু এই গানের কথা, এই 'উচিত কথা' কোথাও কি একটা খিঁচ রেখে গেল? এইচডি রেকর্ডার অন করার পর কাবলু বোস কোনও কথা না বলেই হাঁটা দিলেন কেন? ম্যাডাম ডিএম আরতিরানি অবশ্য এতকিছুর মধ্যে নেই। আরাত্রিকাকে জানালেন, 'আমিন মিয়াঁ তো আমারই আবিষ্কার', পাশের মহিলার দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইলেন, 'কী বলো, অপাপবিদ্ধা?' অপাপবিদ্ধা এর আগেই আরাত্রিকাকে 'বাইট' দিয়েছে। নিজেই। একান্তে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, 'আমার নামের পাশে কবি লিখে দিও, দিদি। 'উনত্রিশের আরাত্রিকা মাইনাস চশমার গুণে চল্লিশোর্ধ অপাপবিদ্ধার 'দিদি' হয়েও ততটা দুঃখ পায় নি যতটা পেল তথাগতর অনুরোধে। তথাগত, কবি এবং সম্পাদক তথাগত, একটা হাজার শব্দের বাংলায় লেখা উত্তর সম্পাদকীয় পাঞ্জাবতনয় বলবিন্দরের হাতে গুঁজে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে সেটার ইংরেজি অনুবাদ করে 'দ্য ডেইলি নিউ এজ'-এ ছাপিয়ে দিতে। সঙ্গে প্রান্তিক মানুষজনের জন্য অর্ধেক দেরিদা আর পোয়াটাক ফুকো মিশিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় নিট জ্ঞান। নিট উইথ নো জাঙ্ক।

এইচডি-র পরামর্শে একটু ঘুরে গিয়ে ঝাঝাঙ্গির ধাবায় রাতের খাওয়া খেতে যায় ওরা। ওখানকার মুগডালের লাড্ডু নাকি অসাধারণ। প্রায় মাঝরাতে, নিশুত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চালসা ফেরার সময়, মহাকাল মন্দিরের ঠিক আগে, বিকট শব্দে ফেটে যায় আরাত্রিকারদের টয়োটা ইটিয়সের সামনের টায়ার। ড্রাইভার সন্দীপ লিম্বু কোনওমতে সামাল দেয় টালমাটাল গাড়ি। লিম্বু, এইচডি আর বলবিন্দর তিনজনেই গাড়ি থেকে নেমে টায়ার বদলাতে হাত লাগায়। মোবাইল টর্চের আলো হাতে হঠাৎ ছিলা টান দাঁড়িয়ে ওঠে বলবিন্দর, জানালার কাচ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আরাত্রিকার হাতে তুলে দেয় একটা ছোট্ট সিসা,

'ইটস্ আ বুলেট, আরাত্রিকা। আ বুলেট উইথ নো জাঙ্ক। পিওর অ্যান্ড সিম্পল বুলেট।'

মহাকাল মন্দিরের শেষ রাতচরা পাখিটিও তখন উড়ে যায় জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে।

পঞ্চম পর্ব

৯

‘হরি, অ হরি, এলি বাপ?’

মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড করতে করতে এইচ ডি জবাব দেয়, ‘হ্যাঁ, মা।’

‘এত দেরি ক্যান, ব্যাটা?’

তরুবালা রাতে ঘুমোন না। কাক, চিল এবং চোর কোনওটাই এই বাড়িতে রাতে ঢুকতে পারে না। তরুবালা সাহার তক্তাপোষ সারারাত জেগে থাকে। এই মধ্য তিরিশেও নাগরাকাটার হরিদাস সাহা, ‘দ্য ডেইলি নিউ এজ’-এর লোকাল করেসপন্ডেন্ট, ‘জলঢাকা নিউজ’-এর সম্পাদক এইচ ডি-র মা শ্রীমতী তরুবালা সারারাত জেগে জেগে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে থাকেন। বাইক সিঁড়িঘরে স্ট্যান্ড করে স্নানে যায় এইচ ডি। আজ আর বাথরুমে নয়, লাগোয়া পুকুরে নামে। একদিনে অনেক হয়েছে। হোমস্টে, আমিন মিয়াঁ, ঝাঝাঙ্গি ধাবা এবং গুলিগোলা। এই সবকিছু ধুয়েমুছে একটা নিটোল স্নান দরকার। এমন একটা স্নান, যা কিনা টায়ার থেকে বুলেট মুছে দিতে পারে, মুছে দিতে পারে সদ্য সঙ্গমের ক্লান্তি।

পঁয়ত্রিশের এইচ ডি অবিবাহিত। বিয়ে করে নি স্রেফ নিজের ইচ্ছায় কিন্তু এইচ ডি-র কৌমার্য একেবারেই প্রশ্নাতীত নয়। ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় ভূগোলের ম্যাম ওকে ডেকে নেন নিজের কোয়ার্টারে,

‘ওপরে উঠি হরি, ওপরে উঠি?’

জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজন ছিল না তবু ভূগোল ম্যাম অনুমতি নিয়েছিলেন। তারপর থেকে হরিদাস সবাইকে ওপরে উঠতে দিয়েছে। তারপর থেকেই শরীরের ভূগোল হরিদাসের মুখস্থ। দেহ বড় জটিল ধাঁধা, কে যে কোন ব-দ্বীপে জেগে ওঠে, কার উপত্যকায় বান ডাকে নি অনেকদিন, কোন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে সিঁথির মত সরু রাস্তা, এইচ ডি জানে। এও জানে যে কোনও জয় রাইডে নীচে শুয়ে থাকাই ওর ভবিতব্য। মফস্সলের বউ ঝিরাও আজকাল জেনে গেছে রাইডের প্রকৃত মুদ্রা। এইচ ডিও জানে সভাপতির মেয়ে ওপরে থাকে, ছাত্রের কাকিমা ওপরে থাকে, ডাক্তারের বউ ওপরে থাকে। এমনকী টাউনবাবুর-র কচি বউ মোবাইলে ছবি দেখতে দেখতে, দ্যাখাতে দ্যাখাতে, ওপরেই থাকে। কেউ কেউ নিজের হয়ে গেলে হরিকে ওপরে উঠতে দেয়,

‘ইচ্ছেমত এসো।’

হরিদাস দাস সাহা এই ফাউ মুহূর্তটুকুর জন্য অপেক্ষা করে।

তবু হরি জিগলো না। সঙ্গমের বিনিময়ে এইচ ডি-র কোনও দাবি নেই। শরীর তো আসলে একই। মুদ্রা এবং মুহূর্তও। তুঙ্গ মুহূর্তে কারও চোখ খোলা, কেউ আধবোজা। কেউ অন্ধকার ভালোবাসে, কারও আলো চাইই চাই। কারও প্রহার পছন্দ, কারও পছন্দ অন্যকিছু। তবু হরি জিগলো নয়। বড়জোর দুপুর ঠাকুরপো। ঠান্ডা জল হরিকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে এখন। জমিনের মত ঠান্ডা। আলপথ বরাবর শীতঘুমে থাকা বৃদ্ধ খরিশের মত তিরতিরে ঠান্ডাজল বয়ে যাচ্ছে শরীর জুড়ে। সাবিত্রীর ঘ্রাণ মুছে দিচ্ছে এই পুষ্করিণী। একমাত্র সাবিত্রীই বলতে পারে, ‘ওঠো হরি, আরো ওপরে ওঠো, শেষ করে দাও আমাকে।’ মৃদুভাষী সাবিত্রীর তখন রুবিয়া ভয়েলের মত পাতলা গলা।

‘হরি, অ হরি, খাবি না ব্যাটা?’

এইচ ডি-র রাতের খাওয়া খুব কম। ছয়ফুটের শরীরটাকে ধরে রাখতে কয়েক ইঞ্চির জিহ্বাকে শাসনে রাখে হরি। খবর আর জমি, এই দুটোমাত্র নেশা হরির। এই তল্লাটের রাস্তাহীন, জল-জংলা জমির ম্যাপ হরির মাথায়। ‘ডিসপুট’ জমির মালিকেরা হরিকে খুঁজে নেয়। যেভাবে খুঁজে নেয় সেক্স-স্টার্ভড মেয়ে বউরা। এক ফালি জমির দাগ থাকে, খতিয়ান থাকে, পর্চা, প্লট নম্বর, জে এল নম্বর... আরও কত কী! নামজারি হয়ে গেলে জমিতে মানুষ বসায় হরি। জমি আর মেয়েমানুষ উদোম ফেলে রাখতে নেই। নজর লাগে। উড়ে যায়। সুলকাপাড়া মোড় হয়ে ডাইনে পিচরাস্তা বরাবর দশ কিলোমিটার গিয়ে আর কোনও রাস্তা

নেই। ভিতরবাগে তিনবিঘা জমি। সুপারি বাগান। জমি থাকলে একদিন রাস্তা হবে, এই জাগতিক নিয়ম হরির জানা আছে। জমির আদি মালিক ঈশ্বর উত্তম ভদ্র জানতেন সেই গুহ্য কথা। ভদ্রবাবুর এক ছেলে ধুপগুড়ি স্কুলের মাস্টার, অন্যজন পলিটেকনিক পাশ করে পিএইচই-র সাব অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। এই ‘রোড’ বিহীন জমি বিক্রি করে ফ্ল্যাট সাজাবে। দালাল লাগিয়ে কাজ হয় নি। অগত্যা হরি। হরিদাস সাহা কাউকে ঠকায় না। হরিদাস সাহা গরিবের জমি মারে না। আদিবাসী জমিনের দিকে তাকায় না। জমি কিনে গাছ লাগায়, পাহারাদার রাখে। ভদ্রদের দুই ভাইকেই ঠিকঠাক দাম দেয় হরি। রাস্তা একদিন হবেই। রাস্তা হয়ে গেলে আবার এই জমি বেচে দিয়ে আরও ভেতরে আরেকটু বেশি জমি কিনবে।

কলকাতা থেকে লোকজন আসে খুব এই পান্ডববর্জিত জায়গায়। আজকাল রিসর্ট বানানোর ধুম লেগেছে। ফাঁকা জমি, পাশে নদী আর একটু জঙ্গল দেখলেই ডবল দাম দিয়ে কিনে নিতে চায়। দুপুর নাই তেপর নাই, স্করপিও চেপে বাবুরা আসে। সুলকাপাড়ার ধাবায় ফস ফস করে উড়ে যায় বিয়ারের বোতল। ছেলে ছোকরাগুলোর হাবভাব বদলে যাচ্ছে। সোনালি রঙের চুল, পেছন উঁচু বাইক। লাটাগুড়ির জমি শেষ। এখন এই তল্লাটে শকুনের নজর পড়েছে। জমি কিনেই সাতফুট উঁচু ইটের প্রাচীর। ভেতরে দোতলা তিনতলা বাড়ি। কত রকমের রুম। এসি, নন এসি। ডিলাক্স, স্ট্যান্ডার্ড। সবুজ জমিতে নানান কিসিমের রুম তৈরি হচ্ছে। জন্তু জানোয়ারের পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ছে এইসব দামড়া রিসর্ট। আরও জমি কিনতে হবে হরিকে, এক পৃথিবী জমি। প্রায় মধ্যরাতে পুকুরে সাঁতার দিতে দিতে, জল কাটতে কাটতে এইচ ডি পুরনো সংকল্পটিকে আবার ঝালিয়ে নেয়। বেচে দিতে হবে সব রাস্তার ধারের জমিগুলো। পাঁচ কাঠা রাস্তার জমি মানে ভেতরে তিনবিঘা। এভাবেই জমি বাড়িয়ে নিচ্ছে এইচ ডি। এভাবেই মধুপুর থেকে নাগরাকাটা। নাগরাকাটা থেকে সুলকাপাড়া হয়ে আরও ভেতরে। জমি বাড়ছে হরির তবে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে আরও ভেতরে। রাস্তা বড় হচ্ছে। রিসর্ট ঢুকে পড়ছে তস্য জঙ্গলে। পেছোতে পেছোতে দেওয়ালে পিঠ যাবে একদিন। তবু নারী ও জমি এ এক আজব নেশা।

আপার চ্যাংমারির পনের বিঘা জমিতে ইদানিং হাতির আনাগোনা। আস্তে আস্তে এলিফ্যান্ট করিডোর হয়ে যাচ্ছে জমির একটা অংশ। বাধা দেয় না হরি বরং অর্ধেক জমিতে কলা গাছ লাগিয়ে রাখে ‘মহাকাল’ বাবার জন্য। বাকি অর্ধেকে লেবুর বাগান। লেবুর কাঁটাকে এড়িয়ে চলে যূথবদ্ধ ঐরাবতের দল। লেবু বিক্রির টাকায় পাঁচটা কামলা পরিবারের দিন চলে যায়। আসলে নিজের জমিতে শুধু বসে থাকতেই ভাল লাগে হরির। জমির মাটিয়ালি গন্ধ, পাতা পড়ার শব্দ, ভাল লাগে হরির। বিএলআরও অফিসের একটা সামান্য কাগজে কি আর জমির চরিত্র বোঝা যায়! জমির ঢাল, মাটির পাথর, ভেতরে লুকিয়ে থাকা পাকা বাস্তুসাপের ঠিকানা লেখা নেই ওই একফালি কাগজে। তবু হরি কাগজ জমায়। নেশা, নেশা। দুটো পেটের আর কতটাকা লাগে? তাও জমি কিনতে থাকে এইচ ডি সাহা। বাপের রেখে যাওয়া মুধুপুর শহরের ওই বাড়ি আর জমি বেচে দিয়ে এইসব ভুতের জমি কিনতে কিনতে গাছ আর মানুষের একটা বড় বৃত্তের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভালই আছে হরি। হাতি নিজেই নিজের রাস্তা তৈরি করে। জমি আর মানুষও। ফলত একদিকে কলা গাছের ঝাড় অন্যদিকে লেবুবাগান। সবাইকে নিয়ে একটা বুঝবাঝ করে চলো হে, এইচ ডি। নিজের মনেই হাসে, ‘দ্য ডেইলি নিউ এজ’-এর করেসপন্ডেন্ট, ‘জলঢাকা নিউজ’-এর সম্পাদক।

তরুবালা কি হরিকে পড়তে পারেন? বুড়িকে মাঝে মধ্যে থট রিডার মনে হয় এইচ ডি-র। যেন তরুবালা টের পেয়ে যান ছেলের প্রতিটা সঙ্গমের ডিটেইলস্। এক এক দিন রাতে বুড়ির চোখের দিকে তাকাতে পারে না হরিদাস। এক্স রে মেশিনের মত

দৃষ্টি। আইবল যেন লেত্তি থেকে ছিটকে আসা লাট্টু।

আজ যেমন।

সঙ্গমক্লান্ত হরি পুকুরের ঠান্ডা জলে জুড়িয়ে নিচ্ছে নিজেকে। পাশের ভাটাম গাছ থেকে গুবগুবি পাখির ডাক আর সাদা মশারির ভেতর থেকে বুড়ির একটানা আওয়াজ, 'হরি, অ হরি, ঘুমোবি না ব্যাটা?

সব রাতে ঘুম আসে না।

ম্যাডাম আরাত্রিকা আর ওই সর্দারজী ফটোগ্রাফারকে দেখে প্রথমে কিছুই মনে হয় নি। তবে শুধু হোমস্টে আর ইকো ট্যুরিজম নিয়ে এত খরচা! খটকা একটু ছিলই। কিন্তু বড় কাগজ, বড় ব্যাপার। উঁচে লোগ, উঁচে পসন্দ... এই ভেবে হরি নিজেকে বুঝিয়েছিল। তবু চালসা রিসর্ট, টয়োটা ইটিয়স এসব বেশ নতুন ব্যাপার। আর আরাত্রিকা ম্যাডাম নিজে এসেছেন যখন, ব্যাপার তো কিছু আছে। কুন্ডুবাবুই যে বকলমে হোমস্টেগুলোর মালিক আর বেশিরভাগ ঘরেই যে দেহ ব্যবসা চলে, এতো আয়নার থেকেও পরিষ্কার। কাল বলার চেষ্টা করেও মুখ খুলতে পারেনি এইচ ডি। আসলে এইচ ডিকে বলার স্কোপ দেয় নি আরাত্রিকা। যেন উনি জানতেন সবকিছু। এখন সবটাই আন্দাজ করে হরি। ম্যাডামকে বোঝাতে হবে নীচে পানের দোকান থাকলেও ওপরে হরি কা মকান। বরাবরের সিলসিলা।

এ তল্লাটের জমি এবং ডিলাক্স রুমের সমুচা খবর এইচ ডি-র নখ ও দর্পণে।

রিসর্টে ফিরে আসার পরেও শরীর থেকে থিরথিরে কাঁপুনি যায় নি আরাত্রিকার। এদের বড় লনে অনেক গার্ডেন চেয়ার ছড়ানো ছেটানো। এত রাতে 'বার' বন্ধ। কিন্তু আজ নিজেই বলবিন্দরকে হুইস্কি বানাতে বলে আরাত্রিকা। বিপদ যে আসবে জানাই ছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেটা এক্সপেক্ট করে নি। হুইস্কির গন্ধটা নিতে পারে না আরাত্রিকা বাট শি ব্যাডলি রিকোয়ার্স আ হ্যালু। বলবিন্দরের স্টক থেকে প্রথম সিপটা নিয়ে হাউসকে সব কিছু ব্রিফ করে ও। এখন চালসা থেকে চতুর্দিক দেখা যাচ্ছে। এই যে দূরের আলোর বিন্দু, জ্বলছে আর নিভছে কিংবা শুধু জ্বলেই আছে, এর নীচেও কত অন্ধকার! অফিস থেকেই তিনটে মেয়ের কনট্যাক্ট নম্বর ওকে দেওয়া হয়েছে। ওর নম্বরও আছে মেয়ে তিনটের কাছে। সময় হলে ওরাই ফোন করবে। আজ কি ওদের কাউকে দেখেছে আরাত্রিকা? ছোট্ট ছোট্ট হোমস্টেগুলোতেও এত সাজানো ফ্রন্ট অফিস, ইউনিফর্মড হাউসকিপিং স্টাফ! হাইলি সাসপিসাস। কুন্ডু কি কিছু আঁচ করল, নাকি শুধু হাওয়ায় বুলেট ভাসিয়ে দিল একটা?

ভাল হুইস্কি রক্তের ভেতরে একটু দেরিতে নাচতে শুরু করে।

বলবিন্দর, আনলাইক বলবিন্দর নিজে খাচ্ছে না একটুও। দুটোর পরে আরাত্রিকাকে বানিয়েও দেয় নি আর। অনভ্যস্ত পানীয় ক্রমশ জাল বিছিয়ে চলেছে পায়ের পাতা থেকে কানের লতি অবধি। এই দুদিনের ঘটনা কোলাজের মত ভাসছে চোখের সামনে। হাউস কি শুধুই কভার করতে পাঠাল ওদের, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম, নাকি এজেন্ডা আরও গভীরে? মাথায় হিম পড়তে শুরু করেছে। ওঠার চেষ্টা করে আরাত্রিকা।

ঘুম ভাঙল কাচের জানালা দিয়ে আসা রৌদ্রে। কড়া রোদ। কীভাবে কাল রাত্রে ঘরে ফিরেছে, মনে করতে পারে না। দরজায় ইয়েল লক, বলবিন্দর বেরোনোর সময় লক করেই গেছে। বেশ কেয়ারিং আছে বটে। গায়ে একটা বেডকভারও দিয়ে গেছে। ভাবতে ভাল লাগছে আরাত্রিকার। কিন্তু এই বেহুদা রোদের জ্বালায় বিছানা থেকে উঠে পড়ে। সাড়ে দশটা। শেষ কবে এত বেলা অবধি ঘুমিয়েছে মনে করতে পারে না। দিনের প্রথম কাজ হিসেবে হরিকে টেক্সট করে,

'এইচ ডি, প্লিজ মিট আস অ্যাট ইলেভেন শার্প।'

এদের ওয়াশরুমটা বেশ। একপাশে দেওয়াল জুড়ে আয়না। বেসিনের পাশে সুগন্ধি পাঁপড়ি। জুঁই ফুলের ঘ্রাণ হাত ধোওয়ার তরলে। স্নানের জায়গাটুকু পিঙ্ক পর্দা দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালে উল্টো করে ঝোলানো ইন্টারকম। রিসিভারের এমন

সমুদ্রনীল রং খুব আনকমন। ঠান্ডা এবং গরম জলের অনুপাত ঠিকঠাক মিশিয়ে গতরাতের টেনশন এবং নিষিদ্ধ তরলের ভার মুছে ফেলতে চাইছে আরাত্রিকা। শরীর আসলে খুব ডিমান্ডিং, প্রতিটি রোমকূপের জন্য করঞ্জ ফুলের সুগন্ধ বিছিয়ে রাখতে হবে। একটু অনাদরের হাওয়া বাতাসে মিশিয়ে দেবে কুটুসের ঝাঁঝালো গন্ধ। উনত্রিশের এই দেহ এখনও অনাঘ্রাত। গোটাকতক তিল, বিশ্বস্ত আয়না আর দেওয়ালের নির্জন বাদ দিলে এই সুন্দরের কোনও সাক্ষী নেই। উত্তর কলকাতার কুড়ি ইঞ্চি দেওয়ালের মতই শীতল মনে হয় নিজেকে। আসলে কি সত্যিই অতটা ফ্রিজিড? আরাত্রিকা জানে এই ভিসুভিয়াস জেগে উঠবে একদিন। ইন ফ্যাক্ট, জাগরণ ও সুপ্তির মাঝের নো ম্যানস্ ল্যান্ডে জেগেও ওঠে অসতর্ক মুহূর্তে। সঙ্গোপনে।

'ম্যাডাম, কত বলব আপনাকে, শুধু কি ওই হোমস্টে জুড়ে দেহব্যবসা? কুন্ডু এবং ওর লোকেরা কী কায়দায় ট্রাইবাল জমি হাত করছে সেটা যদি শুনতে চান...'

সবটাই শুনব এইচ ডি, আপনি গলা নামিয়ে কথা বলুন, এই ডাইনিং হলে অনেক লোক।

'ওকে ম্যাডাম, কত খাস জমির ওপর, ফরেস্ট ল্যান্ডের ওপর রেকর্ডেড জমি বানিয়ে রেখেছে, যদি শোনেন একবার।'

'শুনুন, কুন্ডুর পুরো নেটওয়ার্কের খবর চাই। সঙ্গে পলিটিকাল এবং মিডিয়া ব্যাক আপ।'

'ওকে ম্যাডাম', কুসুম বাদ দিয়ে ডিমের সাদাটুকু মুখে দিতে দিতে সায় দেয় এইচ ডি,

'তবে সবটুকু জানতে হলে মংরাকে ডেকে নিতে হবে।'

'মংরা, হু?'

'গুচ্চির বেল্ট, আর্মানির শার্ট এবং মোচির পয়েন্টেড স্যু।'

'ক্যারি অন', এই গ্রামের সাংবাদিককে দেখে ক্রমশ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে আরাত্রিকা।

'ইন্দ্রাশিস মিত্র। মধুপুরে থাকেন। সাইবার কাফের মালিক।'

'কথা বলতে চাই, আজকেই।'

'এখানে নয়, ম্যাডাম।'

'বেশ, রঁদেভ্যুর জায়গা তবে আপনিই ঠিক করুন', হেসে ফেলে আরাত্রিকা।

'লেবুবাগান। আপার চ্যাংমারি। সাবিত্রীর উঠোন। আর এই টয়োটা গাড়ি বাদ।' চিনি ছাড়া চায়ে শব্দ করে চুমুক দেয় এইচ ডি।

'ডান'।

পলাশতরু নিয়োগী, বাপ্পা দেব আর মংরা মাতালের তখন দুটো করে পেগ সবে শেষ হয়েছে। এটা রাফ ঢালাই-এর সময়। দুই পেগ অবধি রাফ ঢালাই এরপরে পাকা মিস্ত্রির কুরনিতে পালিশ হবে তৃতীয় এবং চতুর্থ পেগ। পঞ্চম পেগে ভারা বেয়ে নেমে যাবে মিস্ত্রি এবং যোগানদারেরা। এরপর শুধু এক মসৃণ ছাদ। মাছি পড়লে পিছলে যাবে এমন মেঝে। নেশার এই বিভিন্ন স্তরে পলাশতরু কবিতা বলে, বাপ্পা দেব ক্লায়েন্টদের ইনকাম এবং খরচের ব্যালান্স শিট কষে মনে মনে, মংরা নেভি কাট পুড়িয়ে ফেলে। একটার পর একটা। নশুর গুমটিতে সন্ধে নামে, করলা নদীর জলে শোলার ফাতনা ফাঁকি দেয় পাকা বোয়াল। রোজকার এই রুটিনে আজ ব্যাঘাত ঘটে। রাফ ঢালাইয়ের ঠিক পরেই ফোন আসে মংরা মাতালের ফোনে। এইসব ঘাতক ফোনের সময়জ্ঞান থাকে না। পলাশতরু এবং বাপ্পাকে একা করে দিয়ে মংরা বাইক স্টার্ট করে। ন্যাকা বাইক মংরা পছন্দ করে না। এক কিকে হেসে ওঠার বাইক চাই ইন্দ্রাশিসের। মাথা, হাত আর পা যদি একসাথে কাজই না করল তবে জীবনে পনেরটা বছর উইকেটের পেছনে গ্লাভস পরে দাঁড়ানো বৃথা।

এই আখ্যানে সাবিত্রী কোনও চরিত্র নয়।

সাবিত্রীরা সেমিকোলনের মত। নন এনটিটি। পৃথিবীর সব সাবিত্রীর মুখে মলিন একটি হাসি। পরনে পরিষ্কার সাদা শাড়ি। ততধিক গাঢ় এবং মোটা সুতির সাদা ব্লাউজ। ব্রা ঢাকা দেওয়ার মত মোটা সুতি। সাবিত্রীদের হাতে কানে জাঙ্ক নেই।

সাবিত্রীরা ঘুঘু ডাকা দুপরে স্নানে যায়। এই সাবিত্রীদের চোখ চিরকাল ঘাস এবং মাটির সঙ্গে কথা বলে। আমাদের সাবিত্রীও লেবু সুগন্ধের মত মৃদু এবং ঝিঙে ফুলের মত অনাদরের। তবু সাবিত্রী এই আখ্যানে কোনও মেজর ক্যারেকটার নয়।

আজ ইলেকট্রিক নেই। নেই আকাশে আলোর ছিটেফোঁটা। মংরার বাইক ফটফট শব্দ করতে করতে কলাবাগান পেরিয়ে এই কুঠিতে এল যখন, তখন চায়ের পর্ব শেষ। তিনটে বেতের চেয়ারে আরাত্রিকা, বলবিন্দর এবং এইচ ডি। চতুর্থ চেয়ার দখল করে মংরা বারান্দার অন্যপ্রান্তে মোড়ায় বসে থাকা সাবিত্রীর দিকে তাকায়। এইচ ডি ভেতরের ঘরে গিয়ে একটা কমদামি রামের বোতল নিয়ে সামনের টেবিলে রাখে। সাবিত্রী নিয়ে আসে কুঁজোর ঠান্ডা জল। এই গোটা আবহে বলবিন্দর এতক্ষণ চুপ করে থেকে এখন মুখ ফুটে আর একটা গ্লাসের ইঙ্গিত করে। আপার চ্যাংমারির বাতাসে কোনও শব্দ নেই এখন, দূরের মরাঘাট চা-বাগানে ক্যানেস্তারা পেটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। পটকার আওয়াজ এত অস্পষ্ট যেন কড়ে আঙুল ফোটাচ্ছে কেউ।

'হাতি বেরিয়েছে', এইচ ডি নীরবতা ভাঙে। কাউকে না কাউকে ভাঙতেই হত এই অস্বস্তিকর নীরবতা। পাশের ইনডং নদীতে ঘাই মারে প্রাচীন মহাশোল।

'এখানে নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল, ম্যাডাম। আপনি কোন স্টোরি চান, বলুন?', মংরার জিজ্ঞাসা।

'শিকার, শিকারের কাহিনি এবং পোচারের হাল হকিকত', অস্ফুটে বলে ওঠে আরাত্রিকা। দ্য ডেইলি নিউ এজ-এর চিফ রিপোর্টার।

'কোনটা চান? স্টোরি ছাপতে? নাকি স্টোরির পূর্বাভাস?'

'দুটোই।' ছোট্ট জবাব আরাত্রিকার।

'তাহলে রিসর্ট ছেড়ে দিয়ে এখানে থাকুন। কাল সকালে বাগডোগরা ফিরে যান আপনাদের গাড়িতে। আবার ফিরে আসুন এইখানে। এইচ ডি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে, দ্যাট রিসর্ট ইজ নট সেফ ফর ইউ। আর ডেইলি কপি এখান থেকেও পাঠাতে পারবেন। নেট আছে। কাল আবার আসব। বাকি কথা তখন হবে। গুডনাইট। ভাল থাকিস সাবিত্রী', লেবু এবং কলাবাগানের মাঝের এলিফ্যান্ট রুট দিয়ে মংরার কালো বাইকের টেইল লাইট মিলিয়ে যায় একসময়।

চালসার রিসর্টে ফেরার সময় এইচ ডির মারুতি অমনিতে বলবিন্দর আরাত্রিকার কাঁধে হাত রাখে,

'দ্যাট ফেলো হ্যাজ রিয়েলি ইমপ্রেসড্ মি।'

'সেম হিয়ার।'

'আই অ্যাম জেলাস।'

আরাত্রিকা অনুভব করে বলবিন্দরের আঙুল টেনে ধরেছে ওর ঘাড়ের সমস্ত চূর্ণ অলক।

ছোট্ট গ্যারাজে গাড়ি রাখে হরি। বাইরের দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে উঠে আসে দোতলার সিঁড়িতে।

হরি, অ হরি, এলি বাপ?'

তরুবালা জেগে আছেন।

১০

'শিবুদা, এই সইঞ্ঝ্যা ব্যালাত মাইনষিলা কেমুন গুবুলফুবুল করির নাইগছে রে।'

'আর না কইস, হামার আমিনচাচা এলা হিরো হয়্যা গেছে। দেখির ধইরছিস না, ডিএম থাকি এসপি সগায় কেমুন বাচ্চে আছে',

শিবু বসুনিয়া, নিউ নেতাজি সংঘের সেক্রেটারি খুব বিরক্ত।

'মধুপুর শহরের অফিসার মাইনষিলা, ক্যাং করি আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরোক হাইজ্যাক কইরবে! হামার বাগজানের আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দর, এইটা কি সগায় পাশুরি গেইছে?'

মধুপুর স্টেশনের এসি ওয়েটিং রুমে বসেও ডিএম সাহেবের ইউনিফর্ম মানে সাদা জামা, নীল প্যান্ট ঘেমে উঠছে। ওপর থেকে নির্দেশ আছে আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরকে

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নিজস্ব ফোল্ডে রাখার। তাই দুজনকেই একটা জমকালো সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। কালকেই। মানপত্র এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আজ মধুকুঞ্জে ওদের থাকার ব্যবস্থা। স্টেশন জুড়ে রিপোর্টারদের ভিড়। ওয়েটিং রুমে ম্যাডাম ডিএম আরতিরানি সঙ্গে অপাপবিদ্ধা সিংহ রায় এবং তথাগত। দুজনেই সাংবাদিকদের নিয়ে একটু ব্যস্ত। আরতিরানিও ব্যস্ত কালকের অনুষ্ঠান নিয়ে। এত শর্ট নোটিশে আর্ট গ্যালারি কীভাবে ভরবে সেই নিয়ে একটা চিন্তা রয়েই গেছে। আরতিরানি অপাপবিদ্ধার কাঁধে হাত রেখে বললেন,

'অনুষ্ঠান তো দুপুর বারোটায়। শেষ হবে দুটোয়, তারপর লাঞ্চ। তুমি বরং দশটা থেকেই একটা কবিতাপাঠের আসর করে দাও একঘন্টার। লোক জমবে। আর বাকি একঘন্টার জন্য তিনটে আবৃত্তি স্কুলকে সমবেত কবিতা আবৃত্তি করতে বল। আর্ট গ্যালারির স্টেজের ডেপথ বেশ বড়। এক একটা স্কুল থেকে তিরিশ জনও যদি স্টেজে ওঠে আবৃত্তি করতে তাহলে ওদের গার্জেন, ফটোগ্রাফার সব মিলিয়ে কম হলেও দেড়শো জন।'

'আর বিয়াল্লিশ জন কবি, তালিকা ধরে ধরে এই সপ্তাহে আপডেট করা হয় নি যদিও। তবে ওই বিয়াল্লিশজনকেই গ্রুপে মেসেজ করে দিচ্ছি', অপাপবিদ্ধা যোগ করে।

'কবিদের ভরসা নেই, নিজের পড়া হলেই কেটে পড়বে। শোনো, গতমাসের 'রসুন' সন্ধ্যায় যে যে গ্রুপগুলোকে ডেকেছিলাম, সবাইকে স্ট্রিক্টলি বলে দেবে আসতে। দর্শক হিসেবে। তাহলে আরও মোটামুটি একশ জন।'

তথাগত উসখুস করতে করতে একসময় বলেই ফেলে,

'ম্যাডাম, আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরের এই উত্থান, প্রান্তিক জনপদ থেকে একেবারে বাংলা বিজয়, এই নিয়ে একটা আলোচনাও তো রাখা যেতে পারে। রাইজ অফ সাবঅল্টার্ন ইন ডুয়ার্স।'

ম্যাডাম ডিএম শ্রীমতী আরতিরানি এই প্রস্তাব এককথায় নাকচ করে দেন,

'শোনো তথাগত, তিনজনের মধ্যে দুজন নিশ্চয়ই অধ্যাপক আর তৃতীয় জন তো তুমি নিজে। এক একজন অধ্যাপক বলা শুরু করলে থামতে চায় না। সময়ের সময়ও নষ্ট হবে, অডিয়েন্সও ভরবে না।'

দশটা নাগাদ আপ হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট মধুপুর স্টেশনে ঢোকে। শিবু বসুনিয়া আর বাগজান গ্রামের মানুষজনকে স্টেশনে রেখেই ডিএম এবং এসপি নিজের নিজের গাড়িতে আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরকে তুলে নিয়ে রওয়ানা দিলেন মধুকুঞ্জের দিকে। পেছনে আরও কয়েকটি সরকারি গাড়ি। দুটি পুলিশের জীপ। পার্টি থ্রো করতে ইলার কোনও অজুহাতের দরকার নেই। আজ তো রীতিমত সলিড গ্রাউন্ড। আমিন আর শ্যামসুন্দরের ওয়েলকাম ব্যাক সেরিমনি। স্টেশনের গ্যাঞ্জামে ইচ্ছে করেই যায়নি ইলা। বরং ছাদের এককোণে সেলার সাজিয়েছে, ক্রকারির নতুন সেটগুলোকে বের করেছে প্যাকেট থেকে। মালতীকে দিয়ে ডিম ভর্তি বোরোলি মাছের তেলঝোল রাঁধিয়েছে একেবারে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। আটটা থেকেই পার্টি জমে উঠেছে। এই তল্লাটের সব বিশিষ্ট মানুষই মোটামুটি এসে গেছেন। এঁরাই মূলত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তবে গত এক বছর ধরেই আপকামিং কিছু ছোকরাও বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক পাচ্ছে এদিক ওদিক। দুই তরফই হাজির এখন। দুই তরফেই মাঝে মধ্যে টুকটাক লেগে যাচ্ছে। মিষ্টি হেসে ইলা ব্যানার্জি বাড়ির পুরনো চাকরদের দিয়ে হাসিমুখে স্ন্যাক্স এগিয়ে দিচ্ছেন বা অনুরোধ করছেন গ্লাস ভরে নিতে। মধুকুঞ্জ ইজ ইন ফুল স্যুইং। এরমধ্যেই ডিএম এবং এসপি সাহেবের গাড়ির কনভয় আমিন ও শ্যামসুন্দরকে নিয়ে এসে পড়ল। সারাদিনের জার্নিতে দুজনকেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ইলা ওদেরকে গেস্টরুমে ছেড়ে আসে।

ওপরে বেশ জমে উঠেছে। মংরা আজ অনেক দেরি করে এসেছে। এই তুতো ভাইটাকে নিয়ে যত জ্বালা ইলার। তবে দেরিতে এলেও ম্যাডাম আরতিরানির সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। নির্ঘাত

কোনও চাল আছে এর পেছনে। বিগতযৌবনা আরতিরানিও মংরার মত স্টাউট চেহারার যুবকের সঙ্গে বেশ ফ্লার্ট করছেন। মাঝেমধ্যেই সামলে নিচ্ছেন তাঁর অবাধ্য শিফন।

ভাল লাগার কি কোনও বয়েস আছে, কাকিমণি? আরতিরানির ঢং দেখে মুচকি হাসেন ইলা। মনে মনেই।

বাগডোগরা থেকে এইচ ডি-র পাঠানো গাড়িতে উঠে যখন ফের আপার চ্যাংমারি পৌঁছল ওরা দুজন, তখন আলো মরে এসেছে। সাবিত্রী আর আরাত্রিকার জন্য একটা ঘর, বলবিন্দর পাশের ছোট্ট ঘরে। এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আরাত্রিকারই বলে দেওয়া। এখানে নেট খুব ভাল। ফোনের নেটওয়ার্কও চলনসই। সাবিত্রী চা নিয়ে আসে সবার জন্য। সাবিত্রী ছাড়া এই পনের বিঘা জমিতে একজন পাহারাদার, সত্তর বছর বয়স কিন্তু এইচ ডি-র খুব প্রিয়পাত্র। মধুপুর ছেড়ে দিয়ে নাগরাকাটা চলে আসার পর এই সুরেশ তামাং-এর বাড়িতেই ভাড়া ছিল কিছুদিন। দুই ছেলে সবকিছু লিখে নিয়ে বুড়োকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই হরি ওঁকে আপার চ্যাংমারি নিয়ে আসে। টুকটাক বাগানের দেখাশোনা, লেবুর সিজিনে কয়েকজন কামলার তদারকি করা... এইসব ছোটখাট কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে গোর্খা রাইফেলস্-এর এই রিটায়ার্ড জওয়ান।

সন্ধে আরও একটু গাঢ় হয়ে এলে এইচ ডির মারুতি ভ্যানে মংরা আসে।

'এই তল্লাটের বেশ কিছু হোমস্টেতে কুন্ডুর সরাসরি ইনভলমেন্ট। কিছু মেয়েকে ঘুরপথে এইসব হোমস্টেগুলোতে নিয়ে আসা হয়। ট্রেনিং-এর নাম করে। এরপর দিল্লি, মুম্বাই, দুবাই... কোথায় নয়! অনেক ট্রাইবাল জমি ঘুরপথে হাতবদল হচ্ছে। জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের চলার পথ আটকে তৈরি হচ্ছে রিসর্ট। তারপর ভুটানি মদের স্মাগলিং। সব নিয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা', মংরা বলেই চলে, 'কিন্তু ইমিনেন্টলি যে বিষয়টা বার্স করতে হবে সেটা ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে। সম্প্রতি শুরু হয়েছে টোকে গেকো বা একধরণের তক্ষক পাচার।'

'সেটা কী?' আরাত্রিকা খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কুন্ডু এবং তার বাহিনী এলাকার গরীব কিছু বনবাসী মানুষকে জঙ্গলে জঙ্গলে ছড়িয়ে দিয়েছে এই তক্ষক ধরবার জন্য। এরকম চললে ডুয়ার্স থেকে প্রায় সাফ হয়ে যাবে এই প্রজাতি। কুন্ডু ইজ আ স্মল বোড়ে। আরও বড় মাথা কাজ করছে এই র‍্যাকেটে', বিষয়টার গভীরে যায় মংরা,

'চীনে এই তক্ষকের চাহিদা এখন মারাত্মক। চাইনিজ মেডিক্যাল হাবগুলোতে বার্মা এবং নেপাল করিডর দিয়ে এই নিরীহ সরীসৃপগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছে যা খবর, দুশো তক্ষকের একটা কনসাইনমেন্ট কয়েকদিনের মধ্যে কুন্ডুর কাছে আসবে তারপর এক্সপোর্ট হবে। আমি জঙ্গলে তক্ষক ধরতে যায় এমন একটি ছেলেকে জোগাড় করেছি। বলবিন্দর আপনাকে যেতে হবে ওর সঙ্গে অন স্পট ছবি তোলার জন্য। ওকে এক্সপোজ না করে যে কোনও ছবি আপনি তুলতে পারেন। শুক্রা ওঁরাও আমার ইনফর্মার। ওকে ছাড়া আমি এই চক্রটাকে পেনিট্রেট করতে পারতাম না।'

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে বলবিন্দর টানটান হয়ে ওঠে,

'কিন্তু আমার এই পাগড়ি? এ তো খুব কনস্পিকুয়াস!'

'প্রয়োজনে পাগড়ির বদলে পাটকা পরে নেবেন। ওপরে টুপি। বাকি ছবি এবং স্টোরি কীভাবে করতে হয়, আপনারা ভাল জানেন। যতদূর খবর, কুন্ডু প্রাণীগুলোকে সেফ হাউসে রাখবে কয়েকদিন। ওই সময়েই আমরা হিট করব। সঙ্গে কিছু প্রকৃতি প্রেমিক সংগঠন, জঙ্গলকে সত্যিকারের ভালোবাসেন এমন দু-একজন মানুষ এবং একজন তরুণ পুলিশ অফিসার। আর আপনাদের কাজ ছবিসহ গোটা ব্যাপারটাকে সর্বভারতীয় নিউজে নিয়ে আসা।'

গোটাটা শোনার পর আরাত্রিকা জিজ্ঞেস করে,

'ইন্দ্রাশিস, আমাদের হাউস কি জানত আপনার কথা, আপনাদের কথা?'

'ম্যাডাম দুনিয়ায় কে যে কার বোড়ে, এটাই সবচেয়ে বড় রহস্য। তবে আপনি ভালর দিকে, সাদার দিকে। আপনি বুদ্ধিমান, নিজেও জানেন সেইকথা। আর হ্যাঁ, আপনার হাউস জানে বোথ অফ ইউ আর ইন সেফ হ্যান্ডস। কোড গ্রিন উইল টেক দ্য বেস্ট কেয়ার অফ ইউ। তবে কোড গ্রিনের কথা কোথাও আসবে না। না আপনাদের স্টোরি, না আপনাদের ডেটাবেস। এখনও পর্যন্ত এটা ক্ল্যাসিফায়েড।'

চলে যাওয়ার আগে এইচ ডি আরাত্রিকাকে আশ্বস্ত করে,

'ম্যাডাম, সুরেশ তামাং বুড়ো হয়ে গেলেও রাত্রিবেলায় ওর চোখ প্যাঁচার মত। নিশানাও। নিশ্চিতে ঘুমোন। অসুবিধে একটু হবে কিন্তু মানিয়ে গুছিয়ে নেবেন।'

যা দেখছে আরাত্রিকা তাতে অসুবিধে কিছু হওয়ার নয়। বাথরুম ওয়েস্টার্ন। পরিষ্কার বালতি মগ। বিছানায় সাদা চাদর ফটফট করছে। সাবিত্রী পাশের খাটে। একই ছাদের নীচে দুই নারী। দুই মেরুর দুই নারী, কিন্তু জীবন এমনই। লাইফ ইজ আ গ্রেট লেভেলার। কোনওদিনও কি আরাত্রিকা ভেবেছিল ডুয়ার্সের এই প্রত্যন্ত গ্রাম আপার চ্যাংমারির প্রায় জঙ্গলে এমন নিশুত রাত্রি কাটাতে হবে? যার একদিকে গন্ধরাজ লেবুর বাগান অন্যদিকে কলাগাছের ঝাড়। মাঝে হাতির পায়ে চলা পথ!

'দিদি, ভয় করছে?'

সাবিত্রীর এই প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। ভয় নয় কিন্তু সিলেবাসে এমন বদল হবে আরাত্রিকা কল্পনাও করতে পারে নি। কোথায় চালসার বিলাসবহুল রিসর্ট কোথায় আপার চ্যাংমারির এই মায়াবী আস্তানা।

'না সাবিত্রী, ভয় নয়। আমি অবাক হয়ে গেছি এত তাড়াতাড়ি এত কিছু ঘটে গেল বলে। থিতু হয়ে ভাবতে পারছি না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি। তোমার তো বাড়ি ঘর সব আছে। আবার ফিরে যাবে, কত বড় চাকরি তোমার, কত ক্ষমতা! আর আমার বাড়ির লোকই আমায় বেচে দিয়েছিল।'

'মানে?', বিছানায় উঠে বসে আরাত্রিকা, 'সে কী!'

'হ্যাঁ, দিদি। সে অনেক কথা। বলব তোমায়। আজ ঘুমনোর চেষ্টা কর।'

'তবে একটা কথা আমি বুঝেছি সাবিত্রী...'

'কী দিদি?'

'এইচ ডি, মানে হরি তোমায় ভালোবাসে। কান্না লুকোলেও পুরুষ তার চাউনি লুকোতে পারে না।'

'জানি না দিদি, তবে এই জীবন আমি এক দেবীর পায়ে উৎসর্গ করেছি।'

আরাত্রিকাকে আর কোনও প্রশ্নের সুযোগ না দিয়েই সাবিত্রীর স্বগতোক্তি, 'রাধারানি।'

এই অরণ্যের পাশে, এই সবুজের সমারোহে আরাত্রিকার ঘুম আসে না। ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসে। বাতাসের এমন পবিত্র সুবাস এই উনত্রিশের জীবনে এর আগে অনুভব করে নি কোনওদিন। শ্রান্তি এবং উত্তেজনা থিতিয়ে আসছে ক্রমশ। একটু দূরে টিলার ওপর সুরেশ তামাং। অন্ধকারে যার চোখ প্যাঁচার মত জ্বলে। বুড়ো সুরেশ তামাং-এর ছোট্ট এবং ঋজু শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রণাম করে আরাত্রিকা। 'যে যেখানে লড়ে যায় আমাদেরই লড়া...', কোন গানের লাইন যে কখন স্মৃতির অতল থেকে উঠে আসে!

শেষ রাতে নিজের বিছানায় আবার ফিরে আসে আরাত্রিকা। শুক্রা ওঁরাও-এর সঙ্গে বলবিন্দর বেরিয়ে গেছে জঙ্গলে। পাশের বিছানায় ঘুমন্ত সাবিত্রী। চোখ বন্ধ করলেই বোল্ড হেডলাইন দেখতে পাচ্ছে আরাত্রিকা, 'গ্রিন ইজ দ্য আলটিমেট কোড ইন ডুয়ার্স'। ছোট ছোট কালো অক্ষরগুলো দুলতে থাকে আরাত্রিকার বন্ধ চোখের পাতায়। ঘুমনোর ঠিক আগে তক্ষকের ডাক ভেসে আসে,

তক্ ক্ষক্। তক্ ক্ষক্।

(চলবে)

নদীর ধারে বাড়ি

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

কাশ্যপ বলল, আবার আমাদের কখনও দেখা হবে সেটা কি তুমি কখনও ভেবেছিলে উৎপল?

চায়ের কাপে অন্যমনস্ক চুমুক দিচ্ছিলাম। মুখ তুলে বললাম, অ্যাঁ?

মেদিনী মিটিমিটি হেসে বলল, আপনি কী ভেবেছিলেন উৎপলদা? পৃথিবীকে গুডবাই করে স্বর্গে চলে গিয়েছি আমরা?

কী বলি এর উত্তরে? বড় বিড়ম্বনায় পড়েছি। কীই বা ভাবা সম্ভব ছিল সেদিন! দু'বছর আগে ডুলুং নদীর জলে ভেসে উঠেছিল দুটো ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া লাশ। কাশ্যপ আর মেদিনীর বাড়ির লোক এসে শনাক্ত করেছিল মাছে খাওয়া বডিদুটো। সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রতি রাতেই ঘুরে ফিরে আসত একটা সময়। ঘুম ভেঙে যেত, আঁতকে উঠতাম বোবা আতংকে।

কাশ্যপ আর মেদিনীকে দেখতে দেখতে দু'বছর আগের কথা মনে পড়ছিল বারবার। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল সারাদিন ধরে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। অফিস কোয়ার্টার্সে তাস পিটছিলাম

আমরা। মেদিনী এল বৃষ্টি মাথায় করে। কেঁদেকেটে জানাল পাশের গ্রাম মুসাফিরগঞ্জে তার কাকিমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় আছে। সেই ছেলের সঙ্গেই মেদিনীর বিয়ে দেবে জোর করে।

মনস্থির করতে কাশ্যপ সময় নিয়েছিল ঠিক দু'সেকেণ্ড। কাশ্যপের বাবা নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু বৃদ্ধা মা। তার দুঃসাহসিক কাজে বাড়ির তরফ থেকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু মেদিনীর বাড়ির লোকেরা গোঁড়া। এই অনাচার তারা যে মানবে না সেটা একরকম জানাই ছিল। কিছুদিন পর ডুলুং নদীর জলে পাওয়া গেল দুটো ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া লাশ। দুজনের পেটেই পাওয়া গিয়েছিল বিষ। রুটিনমাফিক পুলিশ ডায়েরি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভাবা হয়েছিল তাদের বিয়ে সমাজ মেনে নেবে না আশংকা করে আত্মহত্যা করেছিল প্রেমিকযুগল। এখন দেখা যাচ্ছে সেদিন ভুল হয়েছিল। বিরাট বড় ভুল।

কাশ্যপের বাড়ি পুরুলিয়ার গ্রামে। আমি ঢাকুরিয়ার ছেলে। আমাদের বন্ধুত্ব ভেটেরিনারি পড়ার সময় থেকে। পাশ করে বেরোতে না বেরোতেই আমরা যোগ দিয়েছিলাম মহিষবাথান ফার্মে। কাজে যোগ দেওয়ার পর আমাদের প্রথমে ঠাঁই হয়েছিল ট্রেনিজ হোস্টেলে। পরে কাজ দেওয়া হল মিল্ক কলোনিতে। সেখানে চারটে ইউনিট। আমরা দুটো ইউনিটের সুপারভাইজার। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ত দিগন্ত জোড়া সবুজ ঘাস। পরে জেনেছিলাম তাকে বলে নেপিয়ার, যা এক রকম গোখাদ্য। ফার্মে কাজ হত ঘড়ির কাঁটা ধরে। ভোর চারটেয় হোসপাইপ দিয়ে মোষ ধোয়ানো দিয়ে শুরু। ছ'টা থেকে দুধ দোয়া। গোয়ালারা ওই ক্যাম্পাসেই থাকতেন। দশটা মোষ রাখলে একটা কোয়ার্টার পেতেন ওঁরা। আমরা কাটা খড় বিক্রি করতাম গোয়ালাদের। মোষ ভাড়া আর খড়ের বিল করতে হত। দশ দিন অন্তর দেওয়া হত দুধের দাম। এ সব খরচা দুধের দাম থেকে বাদ যাবে, তাই সময়ে বিল পাঠানোটা জরুরি। এ ছাড়াও দেখতে হবে জল, ইলেকট্রিসিটি ঠিক আছে কি না সেসব দেখা।

হোস্টেলে খাওয়া দাওয়া ছিল এলাহি। ডেয়ারির খাঁটি ঘি, তাতেই ভাজা পরোটা, ওমলেট, সুগন্ধি চালের ভাত আর ডিমসেদ্ধ। গোটারি থেকে আসত কচি পাঁঠার মাংস। কোয়ার্টার্সে কার বউ সুন্দরী কিংবা কে একটু 'গায়ে পড়া' সেসব নিয়ে রসালো আলোচনা চলত। বিকেলে ক্রিকেট খেলা কিংবা ফুটবল পেটানো, শীতের সন্ধেবেলা ব্যাডমিন্টন। রাত্তিরে তাস। জুটে যেত মিলিটারি ক্যাম্প থেকে জোগাড় করা রাম। সে ছিল এক অনন্ত চড়ুইভাতি।

ফার্মের কাছেই মসজিদ। ফি শুক্রবার দরগায় মোমবাতি জালাতে আসে হিন্দ-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষজন। সপ্তাহে একদিন হাট। হাটবারে আমি আর কাশ্যপ হাটে যাই। চায়ের দোকানের বাইরে সাইকেল রেখে ঘুরে বেড়াই। সবুজ শাকসবজি, নধর লাউ-কুমড়ো দেখে চোখের আরাম হয়। ডুলুং নদীর সুস্বাদু মাছ কিংবা তাগড়াই চেহারার মোরগ কিনি জলের দরে। গ্রামের মেয়েরা হাটে আসে সওদা করতে। যৌবন উছলে পড়ে তাদের আঁটোসাটো শরীর থেকে। ঘুগনি বিক্রি করতে আসে মেদিনী নামে একটি রূপসী মেয়ে। শালপাতার দোনায় ঘুগনি খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প করি আমরা। যখন ফিরে আসি বুঝতে পারি কাশ্যপের মুখে ছায়া ঘনায়।

ফার্ম থেকে মাইলখানেক দূরে মেদিনীদের মাটির নিকোনো বাড়ি। বাবার ছো- দর্জির দোকান ছিল বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে। মেদিনীর মা ছবি আঁকতে পারতেন। মাটির দেওয়ালে সাদা রঙে চমৎকার সব নকশা তৈরি করতেন তিনি। একদিন মেদিনীর বাবার খুব অসুখ করল। বড় ডাক্তার বললেন, হার্টের জটিল সমস্যা। অপারেশন করতে হবে। জমিজমা বিক্রি করে ভেলোর গেল ওরা। মেদিনীর দিদির ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে। ওর জামাইবাবু আর এক কাকা গেল সঙ্গে। অপারেশন হল। ডাক্তার বললেন, আর কোনও সমস্যা নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সকলে। ফিরে আসা হল গ্রামে। কয়েক

মাস পর আবার ব্যথা উঠল। এবার আর সময় পাওয়া গেল না। শেষ শ্বাস পড়ল মেদিনীর বাবার। ততদিনে নিঃস্ব হয়ে গেছে ওদের পরিবার।

বাবাকে দাহ করে আসার পর মেদিনীর শুরু হল নতুন লড়াই। গ্রামের কয়েকজন ধান ভর্তি বস্তা দিয়ে যেত। মা বড় কড়ায় খড়ের জালে সেই ধান ভাপিয়ে দিতেন। কলেজ যাওয়ার আগে মেদিনী সেই ধান শুকোতে দিত। দু'দিন শুকোবার পর মাথায় করে নিয়ে যেত রাইস মিলে। সংসার চালাতে তখন দিশেহারা ওদের পরিবার। ঘুগনি, চানা, মুড়কি, নিমকি বানাতে শুরু করলেন মেদিনীর মা। কলেজ থেকে ফিরে ঘুগনির হাঁড়ি মাথায় নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করে আসত মেদিনী। পাড়ার লোক বলত, এমন ধিঙ্গি মেয়েকে কে বিয়ে করবে! মা বলত, এসব কথা গায়ে নিস না। মা, তুই জান দিয়ে পড়।

প্রত্যন্ত গ্রাম। লোকের টাকা নেই, শিক্ষা নেই, খাবার নেই। পুরুষগুলো কেউ কাজ করতে চায় না। খেটে মরে মেয়েরা। তারা মাঠে খাটে, বাড়িতে খাটে, বাচ্চা মানুষ করে, তারপরও পুরুষের মুখঝামটা আর মার খায়। এর মধ্যে একদিন মাথায় রক্ত উঠে মারা গেলেন মেদিনীর মা। আত্মীয়দের হাতেপায়ে ধরেও ডাক্তার ডাকতে পারেনি মেদিনী। দু'দিন বিনা চিকিৎসায় ধঁকে মা মারা গেল।

এবার সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ল মেদিনীর ওপর। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। বাড়ি নিকোয়। পুকুরে বাসন মেজে, মাটির উনুনে খড় দিয়ে আগুন জালায়। এক হাতে জলন্ত খড় ধরে থাকতে হয় আর অন্য হাতে হাতা নাড়ে। রান্না করে কিছুক্ষণ পড়াশোনা। তারপর আধঘন্টা টানা হেঁটে কলেজ। ফিরে আবার রাতের রান্না। তখন উনুনের পাশে পড়ার বই খোলা থাকে। সন্ধ্যায় টিউশন পড়তে যাওয়া। বাড়ি ফিরে হ্যারিকেনের আলোয় খাতা বই খুলে আবার ঘন্টাখানেক পড়ে, তার পর ঘুম।

বাবার দর্জির দোকানটা মেদিনী খুলতে চেয়েছিল। একজন ওস্তাগরের সঙ্গে কথাও বলে রেখেছিল। কিন্তু কাকিমা জানিয়ে দিলেন, দোকান যেহেতু পৈতৃক জমিতে, তাই সেই দোকান এখন থেকে তাঁদের। সে মেয়ে। মেয়েদের আবার পৈতৃক সম্পত্তিতে কীসের অধিকার? মেদিনী চোখ মুছে বের হল ধারে কিছু পয়সা জোগাড় করতে। তা দিয়ে ঘুগনি তৈরি করে বেচবে হাটে।

মহিষবাথান হাটেই আমার আর কাশ্যপের সঙ্গে তার প্রথম দেখা। সেখান থেকে প্রেম। প্রেমে পড়া মানুষ আকাশকুসুম ভাবে। ওরা বলাবলি করত নদীর ধারে একটা ছোট বাড়ি বানাবে। সেখানেই কাটাবে বাকি জীবন। আমি হেসে বলতাম, স্বপ্নেই যখন বিরিয়ানি রাঁধছ তখন আরও একটু ডেয়ারির ঘি দাও। দু'কামরার বাড়ি কেন, বরং তাজমহল বানাও!

মাইনের একটা বড় অংশ কাশ্যপকে পাঠাতে হত বাড়িতে। ফলে মাসের শেষে আমার কাছে হাত পাততে হত ওকে। শেষবার কাশ্যপ আমার থেকে কিছু টাকা চেয়েছিল মেদিনীকে দেবে বলে। সেই টাকা দিয়েই ধার করা জমিতে ধান চাষ করিয়েছিল মেদিনী। ট্র্যাক্টর ভাড়া করে জমিতে লাঙল দিইয়ে শ্যালোতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। বীজধান কিনে সেদ্ধ করে খড়ের গাদায় ঢুকিয়ে বের করেছিল অঙ্কুর। কলাগাছ দিয়ে মাড়াই করে বীজ ছড়িয়েছিল জমিতে। গাছ বার হলে সেগুলো ভাল করে ধুয়ে লাঙল দিয়ে জমিতে পুঁতেই তার কাজ শেষ হয় নি। সার দেওয়া, ওষুধ দেওয়া, ধান কাটা, ঝাড়াই, ধানকলে নিয়ে যাওয়া— সব মেদিনী করেছিল একা হাতে। কলেজে বলে কিছুদিন ছুটি নিয়েছিল মাঠের কাজ করতে। ফসল হওয়ার পর কিছু চাল বিক্রি করে, জমি-ট্র্যাক্টর ও শ্যালোর জলের ধার শোধ করেছিল। বাকি চাল বেচে নি। রেখে দিয়েছিল বাড়িতে। সারা বছর নিজেদের খাওয়ার চাল আর কিনতে হবে না।

এর মধ্যেই ঘটল এক ঘটনা। মেদিনীর কাকিমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এই কাঁচা বয়সে এভাবে একা বাঁচতে পারবি না রে মা। ছিঁড়ে খাবে সবাই। আমার খোঁজে একজন ভাল পাত্র

সায়নীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। হানিমুনে আমরা গিয়েছিলাম সিকিমের পাহাড়ে। এবার ওর শখ হয়েছে মহিষবাথানের জঙ্গল দেখার। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর অনুরোধ রাখা সব স্বামীর পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

আছে। গোবিন্দ নাম। জমি-বাড়ির দালালি করে, রোজগারপাতি খারাপ নয়। সে নিজে থেকে প্রস্তাব দিয়েছে তোকে বিয়ে করবে বলে। না করিস না। রাজি হয়ে যা। তুই সুখী হবি, দেখিস। আমি সব বন্দোবস্ত করছি। পরের সপ্তাহেই তোর বিয়ে দেব আমি।

সারা দিন ধরে কেঁদেছিল মেদিনী। সন্ধেবেলা চোখভর্তি জল নিয়ে ছুটে এসেছিল আমাদের ফার্মে। কাশ্যপ একটা ব্যাগে জামাকাপড় যা পারল ঢুকিয়ে নিল। তারপর বেরোল মেদিনীকে সঙ্গে নিয়ে। অসমের নলবাড়িতে ওর এক তুতো দাদা রেলে চাকরি করে। রেল কোয়ার্টারে থাকে। সেখানেই আপাতত উঠবে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে এদিকে ফিরবে। কাশ্যপ নার্ভাস গলায় বলেছিল, উৎপল, প্রার্থনা কোরো আমাদের জন্য। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই। আবার দেখা হবে।

সেই দেখা হল ঠিকই, তবে পাক্কা দু'বছর পরে।

এই দু'বছরে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমি মহিষবাথান ফার্ম ছেড়ে অন্য একটা চাকরি নিয়ে চলে এসেছি কলকাতায়। সায়নীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। হানিমুনে আমরা গিয়েছিলাম সিকিমের পাহাড়ে। এবার ওর শখ হয়েছে মহিষবাথানের জঙ্গল দেখার। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর অনুরোধ রাখা সব স্বামীর পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমার সেটা হয়ে উঠছিল না কাজের চাপের কারণে। এর মধ্যে চেন্নাই আর পাটনা গিয়েছিলাম বিজনেস মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে। সেসব ঝামেলা মেটাবার পর মনে হল মহিষবাথান যদি যেতেই হয় তাহলে এটাই হল হাই টাইম। এর পর সায়নীর পক্ষে জার্নি করা আর সম্ভব হবে না।

দু'বছর আগেও ডুয়ার্সের জলদাপাড়া, গরুমারা বা চিলাপাতার মত মহিষবাথানের জঙ্গল পর্যটকদের কাছে ততটা জনপ্রিয় ছিল না। ইদানিং শুনছি দু'চারটে লজ আর হোটেল তৈরি হয়েছে এদিকে। টুরিস্টও আসছে একটু একটু করে। বর্ষাকাল হল পশুপাখিদের মেটিং সিজন। ফলে জঙ্গল বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি খোলে।

ইন্টারনেট ঘেঁটে মহিষবাথানে কোনও রিসর্টের খোঁজ পেলাম না। তবে এটুকু ভরসা ছিল যে, একবার গিয়ে পৌঁছলে মাথা গোঁজার ঠাঁই একটা না একটা জুটে যাবেই। তৎকাল রিজার্ভেশন করে দুগ্গা দুগ্গা বলে ভোরবেলা ট্রেনে চেপে মহিষবাথান স্টেশনে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধে ঢলে রাত নেমেছে।

জঙ্গলের প্রান্ত ছুঁয়ে নির্জন রেলস্টেশন। দু'চারজন স্টাফ। কয়েকজন যাত্রী নামল প্ল্যাটফর্মে। চেহারা দেখেই মনে হয় স্থানীয় মানুষ। সকলেই ঝাড়া হাত-পা, সঙ্গে বড় জোর একটা ফোলিও ব্যাগ। হন্তদন্ত হয়ে তারা হাঁটা দিল বাইরের দিকে। গেটের কাছে সাদা পোশাক পরা একজন টিকিট চেক করছে। আমি আর সায়নী নিজেদের টিকিট দেখিয়ে বেরোলাম বাইরে। ততক্ষণে যে এক-আধটা অটোরিক্সা ছিল সেগুলো যাত্রী বোঝাই করে বেরিয়ে গিয়েছে।

স্টেশন চত্বরের ফ্যাকাশে আলোতে দেখলাম একটা মান্ধাতার আমলের হলদে ট্যাক্সি দাঁড়ানো। মাঝবয়সি একজন ড্রাইভিং সিটে বসে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছে। কাছে গিয়ে বললাম, এদিকে আপনার চেনা কোনও রিসর্ট বা লজ আছে? সিরিঙ্গে চেহারার লোকটা মুখ ফেরাল। লাল দুটো চোখ। এক টুসকিতে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, বসুন।

ফার্ম যেদিকে সেই চেনা পথে নয়, ট্যাক্সিচালক

ধরল অন্য রাস্তা। ইতিউতি বাড়িঘর চোখে পড়ছিল একটু আগেও। এবার নির্জন এলাকায় চলে এসেছি আমরা। একটু আগেও বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছিল। এখনও পথঘাট ভেজা। আমাদের গাড়িটা দিব্যি চলছিল হঠাৎ মৃত্যুপথযাত্রী রুগির মতো হিক্কা খেতে খেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার ইগনিশনের চাবি ঘুরিয়ে যতই স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে কিছুতেই কাজ হয় না। নিজের আসন থেকে নেমে পড়ল। গাড়ির বনেট খুলে বলল, ফ্যান বেল্টের সমস্যা। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই গাড়ি স্টার্ট নেবে। ইঞ্জিন গরম হলে আবার অবশ্য দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবেই জঙ্গলটা পার করতে হবে। লোকালয়ে না গেলে গ্যারাজ পাওয়া যাবে না।

সায়নীর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে গাড়িতে বসে রইল। আমি দরজা খুলে নেমে আড়মোড়া ভেঙে একটা সিগারেট ধরালাম। মোবাইল বার করে দেখি নেটওয়ার্ক কভারেজ নেই। ফোনটা পকেটে পুরে এগোতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোগা চাঁদ উঠেছে আকাশে। রাস্তার একদিকে ডুলুং নদী। অন্যদিকে ঘন অরণ্য। বড় করে শ্বাস নিলাম। চিকরাশি ওদাল শাল সেগুনের জঙ্গল থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে। ইংরেজি 'ইউ'-এর মতো নদীটা বাঁক নিয়েছে একটা জায়গায়। ঘন গাছপালার আড়ালে দেখি ছোট্ট একটা সাদা রঙা কাঠের বাড়ি।

চাঁদের আবছা আলোয় সব কিছু অপার্থিব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন প্যাস্টেলে আঁকা কোনও ছবি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সুঁড়িপথ গেছে। মনে মনে ভাবছি যেখানে ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে নদীটা ঠিক সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এই বাড়িটা এল কোত্থেকে! দুর্মর কৌতূহল হল। সিগারেটের শেষটুকু ফেলে দিয়ে এগোতে লাগলাম সামনের দিকে। পায়ে চলা পথটা বাঁক নিয়েছে এক জায়গায়। সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম সবিস্ময়ে।

ছোট্ট একটা বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। একটেরে বারান্দা। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা একজন বসে ছিল বেতের চেয়ারে। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলল। তাকে দেখে আমার চক্ষুস্থির। কী আশ্চর্য এ যে কাশ্যপ! কাশ্যপ আমার মতোই অবাক হয়েছে। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে বলল, আরে উৎপল, তুমি! এখানে কি বেড়াতে এসেছ? তারপর ভেতরের দিকে মুখ করে হাঁক দিল, মেদিনী দেখে যাও কে এসেছে!

মেদিনী এসেছে লঘু পায়ে। একরাশ বিস্ময় এসে মিশল তারও মুখে। চোখ বড় বড় করে বলল, উৎপলদা, আপনি!

আমার বিমূঢ় দশা কাটছিল না। হতভম্ব গলায় জানতে চাইলাম, তোমরা এখানে..!

আমার থতমত খাওয়া ভাবটা দেখে কাশ্যপ মজা পেয়েছে। হেসে বলল, মরা মানুষকে জ্যান্ত দেখে অবাক হচ্ছ? কখনও ভূত দ্যাখো নি, এবার তো দেখা হল! হা হা তার পর বলো কী খবর? শুনলাম তুমি নাকি চাকরিটা ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছ?

আমি কাশ্যপের পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, ঠিকই শুনেছ। একটা ক্যাটল ফিড কোম্পানিতে ঢুকেছি। পুরনো কলিগদের সঙ্গে আর সেভাবে যোগাযোগ নেই। কেমন আছ তোমরা?

কাশ্যপ শুকনো মুখে বলল, আর থাকা! মৃত মানুষকে সরকারি নথিতে জীবিত প্রমাণ করা যে কী ঝক্কি সেটা যদি জানতে! সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধেই বলো কিংবা ব্যাংক লোন কিছুই তো পাওয়া যাবে না। ফার্মের চাকরিটাও আর নেই। মহিষবাথানে কিছু চেনা মানুষজন ছিল। তারাই অযাচিত সাহায্য করেছে বলে এই বাড়িটা দাঁড় করানো গেছে। রুজিরোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে হত। তাই হোমস্টে সার্ভিস চালু করেছি।

আমার বিস্ময় কাটছিল না। বললাম, বাহ খুব ভাল।

মেদিনী জানতে চাইল, ফার্মের চাকরিটা তো খারাপ ছিল না। তাহলে ছাড়লেন কেন?

আমি বললাম, অফিস কোয়ার্টার্সে কাশ্যপের সঙ্গে রুম শেয়ার করতাম। সেই ঘটনাটার পর একা

আমার কপালে ঘামের দানা ফুটে উঠছে। ইঁটচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে রং নিচ্ছে আমার মুখ। কেমন গুমোট লাগছে। মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধছে অপরাধবোধ। ভাবলাম ধরা যখন পড়েই গেছি তখন আর কীসের সঙ্কোচ। চাপা স্বরে বললাম, এসব অবান্তর কথা আজ উঠছে কেন? স্বীকার করছি মেদিনীকে আমি ভালবেসেছিলাম। তুমি সেটা বুঝতে পারো নি।

থাকতে গেলে ঘরটা আমাকে গিলে খেতে আসত। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগত। এখান থেকে মনই উঠে গিয়েছিল। চেষ্টা করছিলাম। ওয়াক ইন ইন্টারভিউ দিয়ে কলকাতায় একটা চাকরি জুটিয়ে ফেললাম। তারপর এই চাকরিটা ছাড়তে আর দ্বিধা করি নি। বাড়ির চাপে গতবছর বিয়েটাও সেরে ফেলেছি।

কাশ্যপ বলল, আরে বাহ কনগ্রাটস!

আমি বললাম, আমি আর সায়নী ট্রেন জার্নি করে একটু আগে এসে পৌঁছেছি মহিষবাথানে। স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম মাথা গোঁজার জায়গার খোঁজে। জঙ্গলের মধ্যে ট্যাক্সি গেল বিগড়ে। সায়নী গাড়িতে বসে বসে বোর হচ্ছে। একা একা জঙ্গলের মধ্যে ভয় পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। ফোনের নেটওয়ার্ক নেই বলে রক্ষে নইলে সায়নী ফোন করে করে পাগল করে দিত। যাই আমি গিয়ে নিয়ে আসি ওকে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। কাশ্যপ আমার হাতে চাপ দিয়ে আমাকে নিরস্ত করে বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত কথা আছে। বউদির সামনে সেসব আলোচনা করাটা ঠিক হবে না। আর হ্যাঁ দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এই জঙ্গলে বউদির গায়ে কেউ টোকাও দেবে না।

আমি বললাম, এত নিশ্চিত গলায় বলছ যেন চোরডাকাত হোক বা হিংস্র পশু, ক্ষতি করার আগে তারা তোমার অনুমতি নিয়ে নেবে!

কাশ্যপ হেসে ফেলল। পাশ থেকে মেদিনী বলে উঠল, চিত্রগুপ্তের কথা কখনও শুনেছেন? সেই ভদ্রলোক নাকি আমাদের পুণ্যের হিসেব যেমন সর্বক্ষণ করে চলেছেন তেমনি ব্যস্ত আছেন পাপের অংক লেখায়।

মেদিনীর এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, মানে?

মেদিনী মুচকি হেসে বলল, আমাদের পাশের বাড়িতে এক মৌলবী থাকতেন। তাঁর মুখে আবার শুনেছি কেরামন আর কতেমিনের কথা। উনি বলতেন আল্লার দূত হল ফেরেশতা। হাদিস বলছে ফেরেশতা আলো দিয়ে তৈরি। ফেরেশতা বিভিন্ন রকম চেহারা ধারণ করতে পারে। আল্লার নির্দেশ পালনেই তারা ব্যস্ত থাকে, সারাক্ষণ আমাদের দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা বসে থাকে। কেরামন কষছে পুণ্যের হিসেব, কতেমিন ব্যস্ত আছে পাপের অংক লেখায়।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ মেদিনী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেদিনী নয়, মুখ খুলল কাশ্যপ। গম্ভীর গলায় বলল, আমি আর তুমি একসঙ্গে দিনের পর দিন অফিস কোয়ার্টার্সে থেকেছি। নিজেদের সব কথা শেয়ার করেছি একে অন্যের সঙ্গে। কিন্তু তুমি যে মেদিনীকে ভালবাস সেই কথাটা মুখ ফুটে কখনও আমাকে বলো নি। আমি বুঝতে পারিনি মেদিনীকে পাওয়ার জন্য তুমি এত দূর যেতে পার।

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

কাশ্যপ এমন আচমকা একটা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ তুলবে সেটা ভাবতেই পারি নি। আমি ওকে দেখছিলাম। কাশ্যপ বলল, পরে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি সব। সেদিন আমরা বেরিয়ে

যাবার পর তুমি মেদিনীর বাড়িতে গিয়েছিলে। ওর কাকিমার সঙ্গে দেখা করে গোবিন্দর মোবাইল নম্বর জোগাড় করে ফোন করেছিলে তাকে। আমরা যে নলবাড়িতে লুকিয়ে আছি সেটা পর্যন্ত বলে দিয়েছিলে। কেন, উৎপল?

আমার কপালে ঘামের দানা ফুটে উঠছে। ইঁটচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে রং নিচ্ছে আমার মুখ। কেমন গুমোট লাগছে। মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধছে অপরাধবোধ। ভাবলাম ধরা যখন পড়েই গেছি তখন আর কীসের সঙ্কোচ। চাপা স্বরে বললাম, এসব অবান্তর কথা আজ উঠছে কেন? স্বীকার করছি মেদিনীকে আমি ভালবেসেছিলাম। তুমি সেটা বুঝতে পারো নি। কারণ তুমি ওর প্রেমে অন্ধ ছিলে।

হাসিখুশি পরিবেশটা আচমকা ভারি হয়ে গেছে। মেদিনী মুখটা পাথরের মত করে বলল, উৎপলদা, আপনি তো কখনও সে কথা আমাকে বলেন নি।

আমি বললাম, বলার সুযোগ দিলে কোথায়! তখন যার প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছিলে সে তোমার যোগ্য নয়। অথচ অন্য দিকে তাকাবার ফুরসত ছিল না তোমার।

মেদিনী ভুরুদুটো টানটান করে আমাকে দেখল। শুকনো গলায় বলল, কাশ্যপ আমার যোগ্য নয়? কেন বলুন তো?

পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। ওরা যখন সব জেনেই ফেলেছে তখন ভালই হয়েছে। আড়াল আবডালের ব্যাপার আর নেই। আমি কঠিন স্বরে বললাম, তোমার গরিবস্য গরিব বাবা-মা মারা যাবার পর যখন তুমি মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য লড়াই করছ তখন কে এসে দাঁড়িয়েছিল তোমার পাশে? আমি না থাকলে সেদিন তুমি ভেসে যেতে। স্রেফ ভেসে যেতে।

মেদিনী আমাকে দেখতে দেখতে বলল, তার দাম আপনি এভাবে নিলেন? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আপনার বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমি একটা বিশ্রী গালি দিয়ে বললাম, বন্ধুত্ব মাই ফুট! এই দুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা হাঁটে না। আমি কাশ্যপের পাশে নয়, তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিজের কাছে নিজে চোখ ঠেরে ছিলে। কাশ্যপ তোমার যোগ্য নয়। আমি পাই নি, তাই চেয়েছিলাম গোবিন্দ যদি তোমাকে পায় তবুও ভাল, কিন্তু কাশ্যপ যেন তোমাকে না পায়।

মেদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হে ভগবান!

আমি বললাম, ভেবেছিলাম গোবিন্দ তোমাদের গর্ত থেকে টেনে বের করে বিষ খাইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিংবা তোমরা নিজেরাই পালাতে পালাতে হতাশ হয়ে শেষ অবধি বিষ খেয়েছ। এখন দেখছি ঘটনাটা তা ঘটে নি। তাহলে ডুলুং নদীর জলে সেদিন ভেসে ওঠা দুটো লাশ কাদের ছিল?

মেদিনী স্বগোতক্তি করার মতো করে বলল, আমাদের মহল্লার সেই মৌলবি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি মুনকার আর নাকিব নামে দুই ফেরেশতা আছে। তাদের কাজ হল কবরে ঢুকে মৃতদের জেরা করা। মালিক নামে এক ফেরেশতা রয়েছে জাহান্নামের দায়িত্বে। আর আছে আজরাইল। এরা মৃত্যুর দূত। কারও ইন্তেকালের সময় হলে এরা খুঁজে বের করে আনে তাকে। প্রয়োজনে মাটির নিচ থেকেও তুলে আনে ওপরে।

কাশ্যপ উঠে দাঁড়াল। বারান্দার একটা কোণে এসে বলল, এদিকে একবার আসবে উৎপল? একটা জিনিস দেখাব তোমাকে। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে। কাশ্যপ আঙুল উঁচিয়ে দেখাল এই বাড়ির পেছনের দিকটায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে নদীটাকে। থোকা থোকা হাসনুহানা ফুটে আছে চরে। নদীর দু পাড়ে অশ্বত্থ-বট-জারুল গাছের দল দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বস্ত রক্ষীর মতো। অপার্থিব এক সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। কাশ্যপ ফিসফিস করে বলল, হাসনুহানা ঝোপের ওদিকে ওই আমগাছটা দেখতে পাচ্ছ?

গতবছর এমনই এক বর্ষার দিনে ওই গাছটার ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে ছিল গোবিন্দ। সকালে দু'জন জেলে লাশটাকে দেখতে পায়।

আমি গুলির মতো ছিটকে সরে গেলাম। আঁতকে উঠে বললাম, কী!

কাশ্যপ একটা শ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দর বিয়ে ঠিক হয়েছিল পরের মাসে। বেচারির সামনে লম্বা জীবন পড়ে ছিল। সেই ছেলে আত্মহত্যা করবে কেন? কেউ বুঝতে পারে নি। আসলে কী জানো উৎপল, যখন যার সময় হবে মৃত্যুর দূত তাকে খঁজে বের করবেই।

মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল আমার। কেউ কি ফাঁদ পেতে রেখেছে আমার জন্য? আমার জ্ঞানবুদ্ধির পরিধির বাইরে কী ঘটছে এসব? আমি উঠে দাঁড়ালাম। এক ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। সবুজ অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। হাঁফাচ্ছি। ধুকপুক করছে বুক। পেছন ফিরলাম। না, কেউ তাড়া করে আসছে না আমাকে। মনের বেলুনে সাহসের হাওয়া ভরছি। পেছন দিকে ভিতু চোখে তাকালাম। আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল অজানা আতঙ্কে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি সাদা বাড়িটা নেই। নেই মানে নেই। ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বাড়িটার কোনও অস্তিত্ব এখানে ছিলই না কখনও।

কেউ আসছে এদিকে। সায়নীর গলা চিনতে পারছি। নাম ধরে ডাকছে আমাকে। অন্য গলাটা বোধ হয় আমাদের ড্রাইভারের। হ্যাঁ যা ভেবেছি ঠিক তাই। সায়নী আমার খোঁজে চলে এসেছে। তার পেছন পেছন কাঁকলাস চেহারার ড্রাইভার। ওদের দিকে তাকিয়ে ভূতে ধরা মানুষের মত বিড়বিড় করে বললাম, এখানে একটা সাদা বাড়ি ছিল। কোথায় গেল সেটা?

সায়নী চোখ সরু করে আমাকে দেখছে। বলল, এই জঙ্গলের মধ্যে সাদা বাড়ি আসবে কোত্থেকে?

ওরা দাঁড়িয়ে থাকল কোমরে হাত দিয়ে। আমি পা টিপে টিপে এগোচ্ছি নদীটার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের হাড় জিরজিরে চাঁদ উঁকি মারছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। থোকা থোকা হাসনুহানা ফুটে আছে নদীর পাড়ে। যত এগোচ্ছি ঝিমঝিম গন্ধটা নাকে এসে ঝাপটা মারছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে মাঝনদীতে নির্বিকার ভঙ্গিতে চিত হয়ে শুয়ে আছে মেদিনী। চোখদুটো খোলা। কাশ্যপ শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। একে অন্যের হাত আঁকড়ে শুয়ে আছে দুজনে। নদীর জলে বেশ স্রোত। কিন্তু লাশগুলো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের সূত্র অস্বীকার করে স্থির হয়ে আছে একই জায়গায়।

ডুলুং নদীতে ঠিক এই ভঙ্গিতেই ভেসে উঠেছিল ওদের লাশ। মৃতদেহদুটো দেখার পর প্রবল অপরাধবোধ কাজ করেছিল আমার ভেতরে। আমি গোবিন্দকে ওদের খোঁজ না দিলে ওদের এমন পরিণতি হত না। কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে বমি করেছিলাম সারা দিন ধরে। শরীর খারাপ লাগছিল। দৃশ্যটা বরাবরের মতো গেঁথে গিয়েছিল মস্তিষ্কে। তার পর দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত বারবার।

আমি মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, দ্যাখো সায়নী.. দেখে যাও এসে। দুটো লাশ ভেসে আছে নদীর জলে!

সায়নী কৌতূহলী পায়ে এগিয়ে এসেছে এদিকে। ভাল করে দেখল যতদূর দৃষ্টি যায়। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কী বলছ আবোল তাবোল কথা! কোথাও তো কিছু নেই!

আমি মুখ ফেরালাম নদীটার দিকে। আমার দুটো পা যেন তির দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিল কেউ। এতক্ষণ দেখছিলাম কাশ্যপ আর মেদিনী ভেসে আছে নদীর জলে। এবার দেখি হাসনুহাসনার ঝোপের ওদিকে বিশাল আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে ঘাড় লটকে ঝুলে আছে একজন। না না, একজন তো নয়, পাশাপাশি দু'জন।

ঢোক গিললাম ভয়ে। চাঁদের আলো ঝাঁকড়া আমগাছটার অজ ঘন ডালপালার ওপাশে পৌঁছুচ্ছে না। লোকদুটোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অস্পষ্ট সিল্যুয়েট বোঝা যাচ্ছে। অনুমানশক্তির ওপর ভর

হাঁ করে দেখছি ফাঁসি দেওয়া নিজের শরীরটাকে। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণ কেটেছে জানি না। এবার দেখি কোনও সদ্য আঁকতে শেখা শিশু তার স্কেচবুকে যখন আঁকা মকশো করে তখন যেভাবে অপটু হাতে কিছু এঁকে ইরেজার দিয়ে মুছে দেয় তেমনি করে অলৌকিক দৃশ্যটা মুছে দিচ্ছে কেউ। এতক্ষণ যা দেখছিলাম তা আর এখন দেখতে পাচ্ছি না।

করে চেনার চেষ্টা করছি। লম্বা দশাসই ওই শরীরটা কার? গোবিন্দর নয়তো? কিন্তু গোবিন্দর পাশে কে ওটা? আমার শ্বাসের গতি দ্বিগুণ হল, মেরুদণ্ডে বরফের চাঁই ছুঁইয়ে দিল কেউ। ওই চিবুক, কপাল, দোহারা শরীরের কাঠামো সব তো আমার ভীষণ চেনা! ওটা তো আমি নিজেই! বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এসব কী হচ্ছে? বিভ্রম? নাকি মাথাটাই গেছে আমার?

অন্ধকার এক টানেলের মধ্যে ঢুকে বসে আছি যেন। সায়নী আর ট্যাক্সিচালকের গলার স্বর যেন সুরঙ্গের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে। হাঁ করে দেখছি ফাঁসি দেওয়া নিজের শরীরটাকে। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণ কেটেছে জানি না। এবার দেখি কোনও সদ্য আঁকতে শেখা শিশু তার স্কেচবুকে যখন আঁকা মকশো করে তখন যেভাবে অপটু হাতে কিছু এঁকে ইরেজার দিয়ে মুছে দেয় তেমনি করে অলৌকিক দৃশ্যটা মুছে দিচ্ছে কেউ। এতক্ষণ যা দেখছিলাম তা আর এখন দেখতে পাচ্ছি না।

সম্বিত ফিরল আমার। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখি ডুলুং নদী বয়ে চলেছে প্রবল শব্দ তুলে। হাসনুহাসনার ঝোপের ওদিকের আমগাছটার দিকে তাকালাম। না, কেউ ঝুলছে না তো! এতক্ষণ যা দেখছিলাম তা কি তবে একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ছিল?

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। ঘনিয়ে এসেছে কাছে। কাঁধে আলগোছে হাত দিয়ে সন্দিগ্ধ গলায় বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার কি শুকনো নেশা করার অভ্যেস আছে? তারপর তাড়া দিয়ে বলল, রাত ন'টা বেজে গেছে কিন্তু। এর পর মহিষবাথানে আর মাথা গোঁজার জায়গা পাওয়া যাবে না। বউদি আপনি দাদাকে তাড়া দিন এবার।

সায়নী আমার হাত ধরে টানছে। আমি ফিরে যাচ্ছি। তবুও ফিরে যেতে যেতে কী এক অমোঘ টানে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছি। চাঁদের আলো মেখে স্নান করা ডুলুং নদীটা, ওই ঝাঁকড়া আমগাছটা আমাকে টানছে তীব্র আকর্ষণে। ঘাড় ঘুরিয়ে অসাবধানে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলাম একবার। মুখ থুবড়ে পড়লাম। উঠলাম। কোমরে হাত দিয়ে একটা শ্বাস ফেললাম বড় করে।

মনে মনে ভেবেই চলেছি কথাগুলো। গোবিন্দ কি সত্যিই আত্মহত্যা করেছে ওই আমগাছের ডালে? তাহলে আমার জন্যেও কি একই পরিণতি লিখে রেখেছে আমার ভাগ্যদেবতা? তাহলে আমার কপালে কী নাচছে? ভয়ংকর কোনও মৃত্যু? কে জানে, মেদিনীর কথাই হয়তো ঠিক। আমার পাপস্খালনের ভার, অনিশ্চিত ভবিতব্যের ভার এবার কেরামন আর কতেমিনের হাতে। গোবিন্দর পর এবার আমাকেও কি শাস্তি পেতে হবে? সেই কারণেই কি আমার নিয়তি আমাকে নিয়ে এসেছে ডুলুং নদীর কাছে?

জানি না। মাথা কাজ করছে না ঠিক করে। তবে এটুকু অনুমান করতে পারছি যে, অনুশোচনার আগুনে পুড়তে পুড়তে আমি যতদিন বাঁচব, বেঁচে থাকব ত্রাসে জড়োসড়ো হয়ে, ভয়ংকর এক মৃত্যুভয় বুকে নিয়ে, যতদিন না আজরাইলের ডাক আসে।

আমচরিত কথা

শোভাদিদিমুনি

তনুশ্রী পাল

মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যিস জন্মেছিলাম বাংলার এই সবুজে সবুজ মায়াবী কোণে, তাই না উত্তরের এই রং-রূপ-রসে ভরা রূপসী ভূমিখণ্ডের স্বাদ-গন্ধ এখনও মন-প্রাণ তরতাজা! খুব সাধারণ হলেও আশ্চর্য সব মানুষদেরই বসতি ছিল আশপাশে; তারাও রঙিন করে রাখতেন আমাদের অতি সাধারণ জীবন, তবে সে বয়সের নবীন চোখে ও মনে সবটাই ছিল ভারি আনন্দের। আজকের ভাবি সেসব ঘটনা বা চরিত্র সবই সত্যি ছিল তো? নাকি গল্পকথা?

যেমন শোভাদিদিমণি। একদিন বেশ ক'টি ইন্ডি-গিন্ডি নিয়ে একদিন আমাদের গাঁয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে আসাম থেকে নাকি বাংলাদেশ, নাকি অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছিলেন তা বলতে পারি না। এতবড় ভারতবর্ষ নামের দেশটা পড়ে থাকতে, কী মনে করে বা কার সঙ্গে বা কোন সূত্রে সেই বিরাট চেহারায় একটি মলিন শাড়ি পরে, বাচ্চা ক'টির হাত ধরে তিনি এ গ্রামদেশে এসে হাজির হয়েছিলেন সে তথ্য আমার জানা ছিল না।

তখন সারা দিনমান বাসস্ট্যান্ডের বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে পতুকাকার চা-দোকানে মাছির মত লেপ্টে থাকা, গাঁয়ের মানুষের স্বঘোষিত গার্জিয়ান ক'জনা ছিলেন। আমরা তাঁদের মোটেও পছন্দ না করলেও একপ্রকার বাধ্য হয়ে মেনেই নিয়েছিলাম তাদের জ্যাঠাগিরি। শত বিরক্ত বোধ করলেও 'কী টিউশন থিকে আসলা?' 'কোথায় যাও এখন?' ' রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করবা, তাতে আবার মাইক লাগবে? ক্যান?' ' সাইজাগুইজা সব বন্ধুরা কই যাও? পিকনিক? আমাদের ডাকলা না?' ' কে আইল তোমাদের বাড়ি? মামারবাড়ির লোক? কয়দিন আগেই আসচিল না?' মুখোমুখি হলেই এমনধারার প্রশ্নবাণ তাঁরা চালিয়ে যেতেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে উত্তরও দিতে হত, সেকালের রীতিতে। অবজ্ঞা দেখিয়ে চলে যাওয়ার চল ছিল না মোটে। সম্ভবত তাঁদের পরামর্শেই শোভাদিদিমণি তার অসহায় ভাবমূর্তি নিয়ে সবচেয়ে ছোট দুটি বাচ্চার হাতধরে গাঁয়ের মাতব্বরদের বাড়িবাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করতে থাকলেন। উদ্দেশ্য তারা যদি একটা কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন, নইলে ছানাপোনাসহ পেটে গামছা বেঁধে কতদিন বাঁচবেন? এ গ্রামের বাড়িবাড়ি এত হাঁড়ি ভরা ভাত ফোটে, তিনি কি সপরিবারে উপবাসেই থাকবেন? এতে গ্রামের লোকের মঙ্গল হবে কি?

মঙ্গল-অমঙ্গলের চেয়েও বড় কথা একজন মহিলা বিপদাপন্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,

সাহায্য চাইছেন, তার জন্যে কিছু তো করতেই হবে। গ্রামের মাথা ক'জনা চিন্তাভাবনা শলাপরামর্শ করে ওনাকে প্রাইমারি স্কুলের 'দিদিমুনি' বানিয়ে দিলেন। হ্যাঁ এভাবেও চাকরি হত সে জমানায়। পরে হয়ত পোস্ট স্যাংশান বা অন্যান্য ফর্মালিটিগুলো পূর্ণ করা গেল। আসলে সেকালে ঘরে ঘরে এত ডিগ্রিধারী লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না সুতরাং প্রাইমারি বা হাইস্কুলের চাকরি নিয়ে এত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল না।

যাইহোক, তিনি বহাল হলেন এবং ক্লাস নিতে শুরু করলেন। প্রথমদিকের দিদিমুনি ডাক ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকল; শ্রীকৃষ্ণের অষ্টতর শতনামের মালা না হলেও পড়ানোর গুণে নতুন নতুন নামের নামাবলী জুটল তাঁর। তাঁর আসল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমরা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মায় স্কুলচত্বরের গাছের শাখা-প্রশাখায় উড়েবেড়ানো পক্ষীকুলও পরিচিত হলাম কদিনেই। কোথায় গেল তাঁর সেই মিনমিনে গলা! বরং তাঁর বাজখাই কণ্ঠস্বরে চমকে যেতাম সকলে, গাছের ডালে বসা পাখিরাও ডানা ঝটপটিয়ে পালাত। তিনি ঙ কে বলতে শেখান উংগঅ, ঞকে ইংগঅ, ষ-কে প্যাটকাটা মুইদনশ্য! সম্ভবত ছবি দেখে দেখেই ইংরেজি শেখাতে লাগলেন। বলেন, 'ক দেহিরে এ ফর আফইল, বি ফর বাট, সি ফর কাট, ডি ফর ডোগ; চামচের ছবি আঁকা পি ফর পুন, আর ফর রাট! দুইয়ের ঘরের নামতা আধেকখানি বলে থমকান; তখন আবার চওড়া হাতের থাবায় আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, 'ক' তিনের ঘরের নামতা। জোরে চিৎকার দিয়া ক।' ওনার ত্রিশ অব্দি সংখ্যা গণনা ঠিকঠাক তারপরের উনচল্লিশ থেকে শুরু করে যতেক উন— সেই উননব্বই অব্দি সবই গোলমেলে, কেমন করে যেন আগে পরে হয়ে যায়।

পড়ানোয় হোঁচট খেলেই কখনও বলু মাস্টারমশাইয়ের কাছে যান, কখনও মাঠের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবেন আর চুলের গোড়া থেকে অদৃশ্যপ্রায় কিছু টেনে টেনে বের করে আনেন। ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্রছাত্রীরা বলে 'পুন দিদিমণির মাতায় না উকুন হইচে'। কেউ বলে, দিদিমুনি সুদু থিরি পাশ! কে জানে কোনটা সত্যি, তবে উকুনওয়ালা তায় আফইল আর প্যাটকাটা মুইদনশ্য বলা পুনদিদিমণিকে আমার তেমন মনে ধরে না।

সেই শোভাদিদিমণির বেশ পাড়াবেড়ানি ছিলেন, আজকাল যাকে মিশুকে বলে আর কী। তিনি আমাদের বাড়িতেও আসতে লাগলেন ঘনঘন, বাবা-মাকে বড়দা-বড়বৌদি এবং ঠাকুমা-দাদুকে ধর্ম মা-বাবা ডেকে বেশ একটা ঘরোয়া সম্পর্ক স্থাপন করলেন! বাড়ির আম, কাঁঠাল, মরশুমি শাকসব্জি, গরুর দুধ সবই খানিক পরিমাণে তাঁর বাড়ি যেতে লাগল। আমাদের ঠাকুমা-দাদু তাঁদের ধর্মকন্যাটিকে স্নেহ করতেন।

শোভা দিদিমণি ধীরে ধীরে গ্রামের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে গেলেন। পাঠদানের খামতিটুকু ঢাকা পড়ে গেল গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে হাঁকডাক করে মেলামেশার গুণে। আলাদা করে তাঁকে নিয়ে আর তেমন চিন্তা-ভাবনা রইল না কারোর। উনি নিজের জ্ঞানে যতটা কুলোয় সেভাবেই পড়াতে লাগলেন। খানিক নিজে খানিক সক্ষম ছাত্রদের ডেকে। সেসময়ে লোকের অত কথায় কথায় আন্দোলন বা প্রতিবাদ করার অভ্যাস মোটে ছিল না। সুতরাং দিদিমণির জ্ঞানের পরিধি বা স্কুলের ঘন্টাধ্বনি বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর নিয়ে খানিক তামাশা হত, ব্যাস এই পর্যন্ত।

ঘরোয়া ঢঙে পরা শাদা শাড়ি, ঠোঁটের কোণে পানের রস, চোখে চশমা, বড়সড় শরীরের অনুপাতে ক্ষুদ্র খোঁপাটি তাঁর ঘাড়ের ওপর ঘাপটি মেরে বসে থাকত তাতে বেশ কয়টি কাঁটা গুঁজে রাখা। কাছে গেলে কড়া জর্দা বা তামাকপাতার গন্ধ। রুমালের কোনে গিঁটবাঁধা টাকাপয়সা ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে রাখতেন। ওনার ছোট ছেলেটি ও মেয়েটি কানাই আর গীতা আমাদের সঙ্গেই পড়ত। টিফিনে বরফওয়ালা এলে ওরা মায়ের কাছে পয়সা নিতে ছুটত। তিনটে বরফের দুটি নিজেরা নিয়ে দিদিমণিকে

লাল একটি কাঠিবরফ দিয়ে আসত ভাইবোনে। উনি স্কুলের বাইরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে বরফ খেতেন। শাদা শাড়ি পরা দিদিমণির লাল কাঠিবরফ খাওয়ার সে দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আমাদের গ্রামের চেনা ছবিও পাল্টে গিয়েছিল; সম্ভবত কণ্ঠস্বরের দৌলতেই দিদিমণি ছোটনেতা থেকে ক্রমে মাঝারিমাপের নেতা হয়ে উঠলেন। মিটিং-মিছিলে পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দিতে হাঁটতে দেখতাম। ততদিনে ওনার নিজের একটা বাড়ি হয়েছে দুর্গামন্দিরের কাছে। তাঁর দুঃখের দিনগুলোতে এত আত্মীয়স্বজন কোথায় ছিল কে জানে, এখন দেখা যেতে লাগল দিদিমণির বাড়িতে পরিজনের ভিড় উপচে পড়ে। আমরাও ততদিনে প্রাইমারি শেষে অন্য শহরে হাইস্কুলে গেলাম। তবে আমাদের বাড়ির সঙ্গে ওনার সৌহার্দ্যটুকু ছিলই। পথেঘাটে দেখা হলে যথারীতি উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করতেন, ‘কী র‍্যা কেমন আছস?’

একবার আমাদের পরিবারের সঙ্গে উনি বেড়াতে চললেন কাশী, ওনার নাকি বহুদিন ধরেই বাবা বিশ্বনাথ দর্শনের ইচ্ছে! যাইহোক একটি ঝুড়িব্যাগে ওনার পানের সরঞ্জাম, গামছা, চপ্পল, প্রায় কেশবিহীন মাথাটির জন্যে উৎকট গন্ধযুক্ত তেলের শিশি, আয়না, চিরুনি, তামাকপাতা আরও নানা বস্তু। অন্য একটি ব্যাগে জামাকাপড়। এনজেপি স্টেশন থেকে বেশ হৈচৈ করে ট্রেনে চাপলাম আমরা। পরোটা, আলুরদম দিয়ে রাতের খাওয়া শেষে দোক্তা-পান আরাম করে চিবুতে চিবুতে শোভাদিদিমণি মাকে ফিসফিস করে জানালেন, ‘শায়ায় পকেট বানাইয়ে টাকা নিছি বৌদি আর বাকি খুচরা খাচরা এইহানে’ বলে বাঁ বগলের ধারে উঁচু হয়ে থাকা আঁচলে আঙুল ঠেকান, কাপড়ের টাকার থলের ফিতেটি মালার মত মাথায় গলিয়ে নেওয়া।

সকালে শেয়ালদার কাছেই একটা হোটেলে বাথরুম ও বিশ্রাম সেরে সন্ধের ট্রেন ধরতে হাওড়া, পরদিন বেলা শেষে বেনারস। ট্রেন বেশ লেট। অধৈর্য দিদিমণি এই লেট নিয়ে অন্যান্য সহযাত্রী এবং যতেক হকারদের বলতে লাগলেন, আইচ্ছা নেহি হ্যায়। হামারা বাঙ্গাল মে এইসব নেহি হোতা। লেট নেহি যাতা হ্যায় রেলগাড়ি। হামারা শ্বশুর ভাশুর সব রেলগারি মে কাম করতা। বুজচ, হামারা বাঙ্গাল মে এইসা নেহি চলেগা। বুজচ। তারা কী বোঝে কে জানে, কেউ বিশেষ রা কাড়ে না। আমরা নির্বিঘ্নে লটবহর সমেত অবতরণ করি। শুধু দেখা গেল দিদিমণির দু-পায়ে দুরকমের চপ্পল! কখন বদল হল কার সঙ্গে হল কিছুই বোঝা গেল না! দিদিমণি হা-হুতাশ করেন, রেগে ওঠেন। আর আমরা নতুন শহরটহর নয়, যতেক লোকজন দেখি চারিধারে, সে যাত্রী রিক্সাওয়ালা টাঙ্গাওয়ালা হকার মালবাহক, সব্বার পায়ের পানে চেয়ে থাকি। অগত্যা সে অবস্থাতেই স্টেশন ছেড়ে সেবাশ্রমের দিকে যাত্রা করি তিনটে রিক্সায় মালপত্র সহ।

এক সেবাশ্রমের চারতলা ধর্মশালার দোতলায় পাশাপাশি দুটো রুম বরাদ্দ হয়েছে আমাদের জন্যে। চুল গজানোর তেলের বিকট গন্ধ, জর্দার গন্ধ, বিচিত্র সুর সমন্বিত নাসিকা গর্জন, আর স্থানে-অস্থানে ওনার নিজস্ব হিন্দি ভাষার বিপুল ব্যাবহার নিয়ে দিদিমণি আমাদের রুমমেট; মানে মা, মাসি, আমি আর উনি একঘরে। অপরটিতে বাবা, মেসো, দাদা, ভাই।

যাইহোক বিশ্বনাথ দর্শন, পূজা, গঙ্গাস্নান, গঙ্গারতি দর্শন চলতে থাকল। সঙ্গে রাবড়ি, প্যারা, লস্যি, বেনারসি পান, ‘মাসিমার হোটেলে’ লাঞ্চ-ডিনার, দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। কিন্তু সর্বত্রই দিদিমণি দাম দিতে গিয়ে ঝগড়া বাধান, হামারা বাঙ্গাল মে এত দাম নেহি লেতা; চুর চুর সব চুর হইলা তুমরা। এত দাম নেহি দেঙ্গা। ভারি লজ্জা হয় লোকের সঙ্গে ওনার এমন বার্তালাপে। কিন্তু কী আর করা, ওনার স্বভাব তো আর পাল্টে যাবে না হঠাৎ করে। এক যদি বাবা বিশ্বনাথ কৃপা করেন।

তা বাবা বিশ্বনাথ ফিরে আসবার আগের দিন থেকেই শুরু করলেন, কৃপা তো নয়, বেশ রগড়ই করলেন। দিদিমণি প্রধান টার্গেট। হয়ত ‘হামারা

বাংগাল মে এরকম নেহি হোতা' শুনে শুনে বাবার মনে খানিক ক্ষোভ জন্মেছিল। দু-একটি চেলা পাঠিয়ে ছিলেন সে কারণে? হয়ত! দাঁড়ান এবার বলি সে কিষ্কিন্ধ্যা ও যন্ড কান্ড।

সকাল বিকেল গঙ্গার ঘাটে বসে থাকি, ঘুরেও বেড়াই এদিক ওদিক। শোভাদিদিমণি কাচের চুরি, পেতলের বা পাথরের বাসন, নানা খেলনা-পাতি কেনেন বাড়ির বাচ্চাদের জন্যে কঠোরভাবে দর কষাকষি করে। প্রায় সর্বত্রই জিতেও আসেন। তৃপ্তমুখে বলেন 'আমাগো লগে হ্যারা পারবো না।' অসি, দশাশ্বমেধ, মণিকর্নিকা, রাজঘাট, ললিতঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাট আমরা ঘুরে বেড়াই, গঙ্গার কিনারা ধরে হাঁটি। এক সন্ধেয় নৌকোয় ভেসে অপূর্ব গঙ্গারতি দর্শন হল। দিদিমণি মহানন্দে নিজস্ব হিন্দিতে গলা ছেড়ে মাঝিভাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন। মাঝিটি তরুণ, সে বলে 'মাতাজি আরতি টাইম মে বাত মাত করিয়ে, বাংলা বুঝে। বাদমে কাথা বুলবে। 'দিদিমণির উৎসাহে ঠান্ডা জল, 'হুর বেডা তোর লগে কে কথা কয়।' বলে মুখ ঘুরিয়ে বসেন।

এভাবেই দিনগুলো হুড়মুড়িয়ে ভালই কাটছে। এক বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে যাচ্ছি সবাই, হঠাৎ তরুণ এক ষাঁড়-বাছুর একটা গলি থেকে ছুটে এসে আমাদের দলটির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে লালবর্ণ চোখে তাকিয়ে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল! আমরা এদিক ওদিক দৌড় দিলাম আর শোভাদিদিমণি বিকট কণ্ঠে গালাগাল দিতে লাগলেন, 'আরে ভাগ হিয়াসে, ভাগ ভাগ কইলাম। কুন দ্যাশের গরু হ্যায় তুই?' বাছুরটা কী মনে করে মাটিতে ক'বার পা ঠুকে দৌড়ে এসে এক গোত্তা মেরে দিদিমণিকে রাস্তায় ফেলে ছুটে একটা গলিপথে অদৃশ্য হল। আমরা আশপাশের গোপনস্থল থেকে বেরিয়ে এসে ওনাকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি আমাদের ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে পথের ধুলোর ওপর ঠায় বসে রইলেন। 'নেই উঠেগা। তুমরা কেমুন লোক? আমারে ফেইলা পলায়া গেলা?' যাইহোক অভিমান ভাঙিয়ে দোকানে নিয়ে গিয়ে গরম জিলিপি, সিঙ্গারা, চা-পান করার পর তাঁর রাগ প্রশমিত হল, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

ওই ষাঁড়ের গুঁতো খাওয়ার পরদিনেই, অর্থাৎ ফেরার দিন দুটি কাণ্ড বা অঘটন ঘটল! আমরাও বাকহারা, হতভম্ব, দুঃখিত। সে রাতেরই ট্রেন, আমরা ভোরবেলায় গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলাম। ধর্মশালায় ফিরে বেশ পরিপাটি সেজেগুজে আজ এবারকার মত শেষদিনের বাবা বিশ্বনাথ দর্শন ও পুজোর জন্যে সকাল সকাল বেরোলাম। শোভাদিদিমণি আজ ঘিয়ে রঙ জরিপাড় চমৎকার একটা সিল্ক পরেছেন, অল্পকটি ভেজা চুলই পরিপাটি আঁচড়েছেন; গালের একপাশ ফুলে আছে সম্ভবত পানে। গালে, গলায় একটু ফেস পাউডার ঘসেছেন, বেশ লাগছে দেখতে। বেরোনোর মুখে ওনার শাড়িতেও খানিক স্প্রে ছিটিয়ে বলি 'দিদিমণি আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে আজ।' সলজ্জ হেসে বলেন, 'কী যে কস, মাথায় ক্যাশ নাই, সুন্দর ক্যামনে হমু রে।'

মন্দিরে বড় লাইন, বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পুজো-দর্শন সেরে তৃপ্ত মনে বেরোই। পুজোর ফুল, মিষ্টি সব রুমালে বেঁধে মায়ের কাপড়ের ঝোলায়। পাঁড়েজির দোকানে পুরি-তরকারি, গরম জিলিপি আর দুধ-এলাচের চা খেয়ে ঘাটে গিয়ে বসি। অদ্যই শেষ দিন, আর কোনওদিন আসা হবে কিনা কে জানে। তরতর করে সামনে বয়ে যায় কলুষনাশিনী গঙ্গা, কত রাজ্যের কত মানুষ ডুব দিচ্ছেন জলে। কতরকমের ব্যস্ততা ঘাটগুলো ঘিরে। রোদ চড়ছে, দুপুরে আহারের জন্যে যখন বেরবো তখন কিছু কেনাকাটা করা যাবে, এমন সব গল্প করতে করতে ফিরি।

ঘরে ঢুকে সবে ফ্যানটা ছেড়েছি অমনি বিকট চিৎকার কানে আসে, 'ওরে বাবাগো খাইয়া ফালাইল গো, আমারে মাইরা ফালাইল গো... আরে বাঁচাও গো আমারে...' মনে হল দিদিমণির গলা! সঙ্গে বেশ হইচই কানে আসে। আমরা দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে দেখি গেটের এপাশে

ছোট-বড় মিলিয়ে অনেকগুলো বাঁদর ওনাকে ঘিরে ধরেছে। ঘাড়ে মাথায় উঠে পড়েছে কয়েকটি, শাড়ির আঁচল ধরে ঝুলছে, চুলের ছোট্ট খোঁপাটাও খুলে দিয়েছে, পেছনের কাপড় ধরে ঝুলছে! অকল্পনীয় এবং যথেষ্ট ভয় উদ্রেককারী দৃশ্যটি দেখে আমরাও প্রাণপণ চেল্লাতে শুরু করি। কিন্তু কীসের কী, বানরের দল ওনাকে ছাড়ে না। আশ্রমের লোকেরাই লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে ভয় দেখিয়ে দিদিমণিকে উদ্ধার করল। পালাবার সময় ওনার হাত থেকে শালপাতায় মোড়া প্রসাদ আর পাঁড়ের দোকানের প্যাড়াগুলো কেড়ে নিয়ে গেটের পাশের বড় নিমগাছটায় উঠে পড়ল দলটা। আমরা গিয়ে দিদিমণিকে ধরে ধরে ওপরে এনে জল-টল খাইয়ে অন্য একটা শাড়ি পরাই। অত সুন্দর সিল্কের শাড়ি একেবারে ফর্দাফাই করে দিয়েছে শয়তানগুলো! দিদিমণি খানিক ডাক ছেড়ে কাঁদেন প্যারাগুলোর জন্যে, সিল্কের শাড়িটার জন্যে। মাসিমণি বেনারসি জর্দা দেওয়া পান মুখের সামনে ধরে দিতে ধীরে ধীরে ওনার শোক প্রশমিত হল। মেসো বলেন, ‘আচ্ছা আপনাকে হঠাৎ কেন এরা আক্রমণ করল বলুন দেখি, কিছুই তো বুঝলাম না। প্যাড়াগুলোর জন্যে নাকি?’ ‘হইতে পারে, আঁচলের তলায় ঢাইকা আনলাম তাও দেইখা ফালাইচে।’

রাতের খাওয়া সেরে পোঁটলাপুটলি নিয়ে স্টেশনে আসি, ট্রেন এল। মিনিট দশেকের স্টপেজ এখানে। কামরা আর সিট খুঁজে পেতে, মালপত্র ঠিকঠাক সেট করে বসা গেল। দিদিমণি জানালার ধারের সিটে বসে ইতিউতি চান, ট্রেন ছাড়বার খানিক আগে হাতছানি দিয়ে এক পানওয়ালাকে ডাকেন। জানালার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সে দ্রুত পান সেজে দিদিমণির হাতে দিয়ে দাম চায়। ‘আরে আরেকটু চুন দেতা হ্যায়, খর দেতা, বেশি দেও।’ এমনতর মন্তব্য করতে থাকেন দিদিমণি। লোকটি খর মানে খয়ের বোঝে না, উনি আঙুল দিয়ে দেখান ‘আরে কিচুই বুজো না, কাম করেগা ক্যামনে।’ লোকটি এবার বোঝে পানের ডাঁটিতে খয়ের লাগিয়ে দিয়ে বলতে থাকে, ‘জলদি পয়সা দিজিয়ে মাইজি, টিরেন ছুট যায়গা আভি।’ ‘চুন দেতা আরেকটু সুপারি দেতা’।

ট্রেন হুইশেল দিয়ে নড়ে উঠে চলতে শুরু করে; ট্রেনের গতি বাড়তে থাকে, পানওয়ালা পাশে পাশে দৌড়োয় আর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পানের দাম চায়, দিদিমণি তখনও চুন আর সুপারি চাইছেন। লোকটি আচমকা কী একটা গালাগালি দিয়ে দিদিমণির চোখের থেকে চশমাটা টান মেরে খুলে নেয়। চশমা ও স্টেশন ছেড়ে ট্রেন দ্রুত এগোয়, দিদিমণি হাহাকার করে ওঠেন। এবার মা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, ‘কখন থেকেই তো পানের দাম চাইছিল ও, আপনি খালি খর দাও চুন দাও করে করে টাইম কাটালেন। ও বেচারা কী করবে! শেষে চশমাটাই চোখ থেকে টেনে নিল। বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি পানওয়ালার।’ মায়ের এই বাক্যে, পানওয়ালার প্রতি পক্ষপাতে ও তার বুদ্ধির প্রশংসায় দিদিমণি বেশ রুষ্ট হলেন, কারও সঙ্গেই আর তেমন বাক্যালাপ করলেন না। প্রায় গোটাপথ বেশিটা সময় ওপরের বাংকে নাসিকা গর্জন সমেত নিদ্রাগত রইলেন।

ফেরার পরে বহুদিন আর সাক্ষাৎ হয় নি। তবে শুনেছিলাম বেনারস থেকেই নাকি কী এক কেশবর্ধক তেল এনেছিলেন যা তিনদিন রাতে মেখে ঘুমালেই সকালে উঠে দেখা যাবে মাথা থোকা থোকা চুলে ভরে যাবে। প্রথম রাতেই বিশেষ ভেষজ তেল জবজবে করে মেখে ঘুমিয়ে পড়েন মহাশান্তিতে। কিন্তু পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গেই ওনার মাথা ভরা চুলের স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সকালে বিছানা ছাড়ার প্রাক্কালে বালিশ থেকে শুধু শূন্যকেশ চকচকে মাথাটি উঠে আসে, রুগ্ন ও ক্ষুদ্র বেণীটি নাকি একাকী বালিশেই পড়ে থাকে!

বেশ কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন বাসস্ট্যান্ডে দেখা। একটু রোগা হয়েছেন, বয়সের হাল্কা ছাপও পরেছে চেহারায়। তবে দেখলাম মাথায় একটা জবরদস্ত খোঁপা। সেটি তার এক নাতি নাকি কলকাতা থেকে এনে দিদাকে উপহার দিয়েছে।

আমি জলপাইগুড়ি থেকে আসছি

অরিন্দম ভট্টাচার্য। ৫ মে

প্রথমেই বলে রাখি লেখাটা নিতান্তই মজা করার জন্য, কেস দেবেন না প্লিজ।

সময়টা ২০০১-০২। ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে P&RDর এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি। প্রচুর কাজ, সারাদিন লাফাচ্ছি ঝাঁপাচ্ছি দারুন সুন্দর একটা সেট আপ-এর মধ্যে খুব আনন্দে আছি। আর প্রচুর লাই পেয়ে মাথায় উঠেছি বলা যায়। সে যা হোক সরকারি পয়সায় কলকাতায় যেতে আমি খুব ভালবাসি। কারণ আমার ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ি, বাবার শ্বশুরবাড়ি, এমনকি আমারো শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। তারপর বন্ধুবান্ধবরা তো আছেই। মানে মচ্ছোব আর কি। এমতাবস্থায় বেশ কিছু কাজ কলকাতায় সদর দপ্তরে গিয়ে করিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারমধ্যে অনেকটা সেকশনে ঘুরে ঘুরে সারতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুবিনয়বাবু, তা ওনার তো এবার অসুবিধা দেখা দিল। আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে পড়লাম— আমি যাব। সাহেব মোটেই রাজি ছিলেন না কিন্তু আমি এমন ঘ্যানঘ্যান করলাম যে মোটামুটি রাগ করেই রাজি হয়ে গেলেন। তারপর দরদাম শুরু হল। হিসাবে দেখা গেল কাজগুলো করতে সুবিনয়বাবুর ৪ থেকে ৫ টা ওয়ার্কিং ডে লাগার কথা, সে ক্ষেত্রে আমাকে সাতটা ওয়ার্কিং ডে দেওয়া হল। অর্থাৎ আমি শনিবার রওনা হব আর পরের বুধবার আমাকে অফিসে হাজিরা দিতে হবে এবং সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এর অন্যথা হলে তিন মাস কলকাতায় যাওয়া বন্ধ। নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছি পিছন থেকে বড় সাহেব ডাকলেন— শোনো, সেকশনে ঢুকে বেশি সাহেবিয়ানা ফলিও না, শুধু একটা কথা মাথায় রাখবে, আমি জলপাইগুড়ি থেকে আসছি।

—ইয়েস স্যার, বলেই আমি দৌড়।

কলকাতায় পৌঁছে সোমবার চানটান করে মিস্ত্রি পরিভাষায় যাকে বলে ফাস্ট সকালে অফিসে গিয়ে হাজির। গিয়ে প্রথমে যা যা করতে হবে সেগুলো নোটবুকে লিখে ফেললাম, মোটামুটি দু পাতা হল। তারপর তড়াক করে উঠে যুদ্ধে নেমে পড়লাম। প্রথমেই সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের থেকে এক প্যাকেট ইন্ডিয়া কিংস ঝেড়ে দিলাম, তারপর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের ঘরে ঢুকে বিভিন্ন টাইপের খেজুর করে এটা ওটা খেয়ে সোজা জয়েন্ট সেক্রেটারির ঘরে। এখানেই আমার প্রাথমিক কাজ শেষ। কাজেই চা-বিস্কুট খেয়ে সাহেবকে কিছুক্ষণ বাঙাল ভাষার প্র্যাকটিস দিলাম। পৌনে একটায় বেরিয়ে দেখি, যাবতীয় সাক্ষরতা কর্মসূচি, লেনদেন পর্ব, ফাইলে অনুমোদন মোটামুটি শেষ।

এবার সেকশনে ঢুকতে হবে, মনে মনে গুরুকে স্মরণ করে জয় মা বলে আমার মেডেন ভেঞ্চার-এ নেমে পড়লাম। আমাদের লাইনে সবই গুরুমুখী বিদ্যা। কাজেই উদ্দিষ্ট বাবুটির চেয়ারের সামনে গিয়ে তাকে না দেখে পাশের বাবুটিকে বললাম— আমি জলপাইগুড়ি থেকে আসছি কিছু কাজ ছিল। বাবুটি অনেকক্ষণ জুলজুল করে আমাকে দেখলেন— বোধ করি জামা প্যান্ট পরা চান করা চুল আঁচড়ানো মায় ডিও স্প্রে লাগানো প্রাণী উনি এক্সপেক্ট করেন নি। আমার পাতার ঝালর পড়ে, মাথায় পালক গুঁজে, গায়ে উল্কি এঁকে, হাতে বল্লম নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিছুক্ষণ থমকে থেকে উনি চিল চিৎকার পারলেন— জলপাইগুড়ি থেকে এসে লোক বসে আছে, গদাই কোথায়।

তা গদাইবাবু তো হন্তদন্ত হয়ে এসে অধিষ্ঠিত হলেন। তারপর ঘামটাম মুছে ভারী মোলায়েম করে শুধোলেন— জলপাইগুড়ি! আজকেই দার্জিলিং মেল ধরবেন তাই না? আমি অত্যন্ত করুণ মুখ করে ঘাড় নাড়লাম। এরপর উনি কৌতুহলী হয়ে পড়লেন— আচ্ছা আপনাদের জায়গাটা হিলস না প্লেইনস? আমি

বললাম, হিলসও ধরতে পারেন আবার কিছু কিছু প্লেইনস আছে।

—চারিদিকে জঙ্গল তাই না।

—হ্যাঁ বলতে পারেন জঙ্গলেই থাকি।

—কাগজে দেখলাম সেদিন চিতা বাঘ এসেছিল, কি যেন একটা পার্কে।

—শুধু চিতাবাঘ! হাতি গন্ডার অজগর ছড়াছড়ি চারিদিকে।

—বলেন কি মশাই!

এতক্ষণে আমার ভিতরে প্রায় আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়ে গেছে। দাঁত চেপে বললাম,

—সকালে উঠে তো প্রায়ই দেখি, উঠোনে কুমির শুয়ে আছে।

ততক্ষণে ওনার চোখ গোল্লা গোল্লা হয়ে গেছে, অস্ফুটে বললেন,

—তারপর?

অম্লান বদনে বলে দিলাম, ২-৪ পাউন্ড পাউরুটি খেয়ে তবে যায়। সে এক বিশ্রী ঝামেলা।

এবার ওনাকে ঘাম মুছতে হলো, কুমির পাউরুটি খায়?

—না মানে ওই মুখ বদল আর কি। সেঁকে দিলে বেশি পছন্দ করে।

উনি একটু জল খাওয়াতে বুঝলাম এনাফ অফ ওয়াইল্ড লাইফ। প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে।

এবার ব্যাগের থেকে বিভিন্ন কাজের কাগজ বের করতে শুরু করলাম। কিন্তু ওনার তখনো বাকি আছে। এবার জিজ্ঞাসা করলেন,

—আপনাদের ওখানে নাকি খুব কেএলও। সমস্যা হয় নাকি।

মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে চালিয়ে গেলাম— সে তো সবসময়ই রাস্তা দিয়ে একে ফরটিসেভেন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রায়ই বাড়িতে এসে চা-বিস্কুট খেয়ে যায়। মাসে মাসে টাকা নেয়, তবে কিছু বলে না। আমরা ওখানকারই তো। কিন্তু গঙ্গার ওপারের লোক একদম সহ্য করতে পারে না।

—বোঝে কি করে?

—কেন ভাষা! এলুম গেলুম খেলুম বললেই হালুম।

এবার পরিস্থিতি লাইনে এলো। বললেন— কই কি কি দরকার বলুন।

তারপর চোখের সামনে ইতিহাস রচিত হলো। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছয় কাপ চা চারটে ডিম টোস্ট দুটো বাটার টোস্ট খেলাম। আর আমার সেই বাবুটি আমাকে নিয়ে চরকির মত ঘুরতে লাগলেন। আর আমি দুঃখী দুঃখী মুখ করে, কাগজ কুড়োতে লাগলাম। পাঁচটা দশে আমার ঘড়া থুড়ি ব্যাগ পূর্ণ হল। এবার করজোড়ে বিদায় বেলায় মুখে বেল ফাটা হাসি ফুটিয়ে বললাম— আসি তাহলে, এবার ক্রিসমাসে আমাদের ওখানে আসুন না। কোনও অসুবিধা হবে না।

অস্ফুটে উত্তর এলো, মাফ করবেন, বন্যেরা বনে সুন্দর আর আমরা কলকাতায়। আসুন নমস্কার।

খেলা তখনো বাকি ছিল, স্ট্র্যান্ড রোডের স্টেট ব্যাংক থেকে চেক বই নিতে হবে। সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন ০৫.৪০ ম্যানেজার বললেন— আমি তো করে দিলাম এখন দেখুন যদি কিছু করতে পারেন।

দরদর করে ঘামতে ঘামতে গিয়ে দেখি চেক বইওয়ালা মোটামুটি দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। একটু হাঁপিয়ে নিয়ে বললাম— জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। দার্জিলিং মেল, চেকবুক। এই যে কাগজ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চেকবই বের করতে শুরু করলেন। এমত অবস্থায় এক মারবার নন্দন কিছু এথি দিয়ে চেকবুক বার করার চেষ্টা করাতে উনি তাকে মারতে বাকি রাখলেন। আর আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে জলপাইগুড়িবাসী হিসেবে অভিহিত করলেন। যাদের ফেরানো যায় না।

সাত দিনের কাজ সেরে বেরিয়ে অস্ত সূর্যের দিকে দুহাত মেলে দিয়ে একবার ইয়াহু বললাম।

তারপর— বুধবারই ফিরেছিলাম ঠিকঠাক। বাকি দিনগুলো? আমার ফ্রেন্ডলিস্টে পুরনো বড়সাহেবরা আছেন, সরকারি টিএ ডিএ খেয়েছি, ধরুন না কাজই করলাম।

পুনশ্চঃ ২০০৭ সাল— আমি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, অনিন্দ্য এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার খাস কলকাতার ছেলে। কাজেই কাজ নিয়ে কলকাতায় যাবে। বেরোনোর আগে পিছু ডাকলাম, শোন মনে আছে তো, আমি জলপাইগুড়ি থেকে আসছি আর আজকেরই দার্জিলিং মেল...

খুচরো ডুয়ার্স

ছোট ফুল বড় ফুল

কলম সিং

ডুয়ার্সে বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। দুম দাম শব্দে বজ্রপাত হইতেছে। কলিকাগ্রাম কল্কে সমিতির সদস্যরা বৃষ্টি আর বজ্রের যুগলবন্দী শুনিতে শুনিতে হিসাব করিয়া দেখিতেছে যে জীবনে কতখানি চৈনিক আর কতখানি ইন্ডিয়ান। কেউ কেউ সন্দেহ করিয়াছিল যে মহাতামাক চিন হইতে আসে কি না। যখন জানা গেল উহা খাঁটি আত্মনির্ভরশীল প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত, তখন স্বস্তি হইল।

এইদিক আবার ছোটফুল হইতে কাহারা বড়ফুলে যাইবে— ইহা লইয়া আলোচনা জমিয়াছিল। দারোগা বসুনিয়া কহিলেন, 'আমার মনে হইতেছে বড়ফুল ক্রমশঃ ছোটফুলের বি টিম হইয়া যাইবে। একুশ সালে বিজেপি খাতায় কলমে জিতিবে ঠিকই কিন্তু আসলে জিতিবে ছোটফুলের মাসতুতো ভাইয়েরা।'

পরম দেশভক্ত সদস্য হরেরাম গোস্বামি পৈতা ঠিক করিয়া কহিলেন, 'আমরা অচিরেই ছোটফুলের সহিত চৈনিক সম্পর্ক প্রমাণ করিয়া দিব। তখন দেখিবেন উহাদের দল কেমন তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙিয়া পড়ে। বৈকুন্ঠপুরে আমাদের পার্টি আপিস বানাইবার উদ্যোগ চক্রান্ত করিয়া বানচাল করা হইতেছে— তাহা জানেন কি?'

তখন সমিতির সকলে হৈ হৈ করিয়া কহিল, 'তাই নাকি? খুলিয়া বলুন তো কী ঘটিয়াছে।

গোস্বামি কহিলেন, 'বৈকুন্ঠপুরে আমরা একখানি আলিশান পার্টি আপিস বানাইব। আমাদের তো টাকার অভাব নাই। ইহার জন্য একখানি জায়গাও মিলিয়াছে। কিন্তু বৈকুন্ঠপুরের জায়গিরদার সম্মোহনবাবু কিছুতেই অনুমতি দিবেন না। শেষে ছোটফুলের সহিত তাঁহার চুক্তি ফুরাইল। মহাদিদি আর চুক্তি রিনিউ করিলেন না। সম্মোহনবাবুর জায়গিরদারি চলিয়া গেল। কিন্তু চলিয়া যাইবার আগের দিন তিনি আপিসের প্ল্যান পাস করিয়া দিলেন।'

সকলে সবিস্ময়ে কহিল, 'কেন কেন? হঠাৎ তিনি মত বদলাইলেন কেন?'

'আরে উনি ভবিষ্যতে বড়ফুলে আসিবেন। উনি খুব পাজি লোক সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ফুলে আসিবার পর ওনার দোষ কাটিয়া যাইবে। আবার উনি নির্মল এবং পাপমুক্ত হইবেন। তখন তাঁহার বসিবার জন্য আপিস চাই। সে আপিস বড়ফুল ছাড়া আর কে দিবে?'

উদীয়মান যুবনেতা খগেশবাবু কোন ফুলে যাইবেন ঠিক করিতে পারেন নাই। তিনি জিগ্যেস করিলেন, 'প্ল্যান পাস হইয়াছে যখন তখন আর সমস্যা কোথায়?'

তখন জানা গেল সম্মোহনবাবুর পরিবর্তে যিনি জায়গির দেখাশোনার দায়িত্ব পাইয়াছেন সেই পিউ কাঁহা দেবী নাকি প্ল্যান পুনরায় ফেল করাইয়াছে। কলিকাতা হইতে ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিয়া জনৈক খিটকেল বাড়ুজ্যে আসিয়াছিলেন। বৈকুন্ঠপুরের কোটাল বাহিনী তাঁহাকে গুঁতাইয়াছে।

সমিতির সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, না না। ইহা খুব অন্যায়। বৈকুন্ঠপুরে আলিশান আপিস

হউক। আপিসে গন্ডা গন্ডা ঘর থাকুক। প্রতি ঘরে এসি হইতে শীতল সমীরণ নির্গত হউক। সেই সমীরণে বসিয়া বড়ফুলের ভক্তগণ কুড়ি লক্ষ কোটি টাকা গণিবে।

এমন সময় সমিতির জনৈক ছোকরা সদস্য জিগ্যাসিল, 'আচ্ছা! আলিনগরের সুগন্ধীবাবুর খবর কী? তাঁহার করোনা হয় নাই তো?'

'বালাই ষাট!' গোস্বামি এক ছিলিম টানিয়া কিয়ৎকাল মৌন থাকিবার পর বলিলেন। 'আসলে বৈকুণ্ঠপুরের দায়িত্ব হারাইয়া উনি ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। মহাদিদি রাধামাধবকে ডাকিয়া বৈকুণ্ঠপুরের দায়িত্ব দিবার পর হইতেই ওনার মন খারাপ। এই সময় কেহ একটু উৎসাহ দিলেই তিনি বড়ফুলে চলিয়া যাইতে পারেন। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন। কয়েক মাসের মধ্যেই ছোটফুলের রাশি রাশি বিধায়ক বড়ফুলে চলিয়া আসিবে। তখন উনিও আসিবেন।'

এইবার আমার নিকট কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হইল। কয়েকদিন ধরিয়া বৈকুণ্ঠপুরের অলিতে গলিতে মহাতামাকের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মাঝে মধ্যেই সম্মোহনবাবু, সুগন্ধীবাবুর লোকজনের সহিত দেখা হইত। তাঁহাদের মুখের চেহার রৌদ্রদগ্ধ আমসির ন্যায় হইয়াছে দেখিয়া ভাবিতাম নগরের বরাহ ধরিবার কাজে তাঁহাদের খুব শ্রম হইতেছে। এখন বুঝিলাম যে তাঁহরা ত্রিশঙ্কু হইয়া ঝুলিতেছেন। উন্নয়নের অর্থে তাঁহারা বিদেশ ঘুরিয়া ফেবুতে পোস্ট দিতেন। কেহ একটু পাশে দাঁড়াইয়া স্কন্ধে গেরুয়া হস্ত রাখিলেই তাঁহার বড়ফুলে গিয়া পাপস্খালন করিতেই পারিত, কিন্তু 'আপিস' লইয়া সকলে মত্ত থাকায় বর্তমানে তাহা প্রায় আনপসেবল।

ছোটফুলের আগমার্কা সাপোর্টার এবং সমিতির সদস্য আঙ্কেল চ্যাং এতক্ষণ চুপচাপ শুনিতেছিল। এইবার সে মুখ খুলিল। 'তাহা হইলে আমরাই ভবিষ্যতে বড়ফুলের কেয়ার অফে বাঙলায় আসিতেছি— কী বলেন গোঁসাইজি?'

গোস্বামী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'ইহা ছাড়া উপায় কী? নিয়মিত যোগ অভ্যাস করিয়াও আমাদের নেতাদের মুন্ডু ঠান্ডা হয় না। ক্ষমতায় আসিলে মন্ত্রী কে হইবে?'

আমি মোবাইল খুলিয়া তাড়াতাড়ি মহাকবি পুরন্দর ভাটের সদ্যরচিত কবিতাখানি সকলকে দেখাইলাম। কবিশ্রেষ্ঠ লিখিয়াছেন—

পদ্মফুল পদ্মফুল
ভিতরে তার তৃণমূল।
ডাডাম ডাম ডিম ডিম
ছোটফুলের বি টিম।
এই ফুলেতে করে পাপ
ওই ফুলেতে গেলেই মাপ।

পড়িয়া গোস্বামি খাপ্পা হইয়া কহিলেন, 'এই তোমাদের মহাদোষ! অবশ্য মূল দোষ জহরলালের। তবে তোমাদের সেই দায় লইতেই হইবে। এই কারণেই আমরা ক্ষমতায় আসিয়া তোমাদের ঠ্যাঙাইব। এমন ঠ্যাঙাইব যে আর কখনো বিরোধিতা করিতে পারিবে না।'

শুনিয়া সবাই একবাক্যে স্বীকার করিল, 'ঠিক ঠিক! গোঁসাইজির কথা এইবার ছোটফুলের মতই লাগিতেছে।'

পুনশ্চঃ ডুয়ার্সে করোনা ছাড়া আর কিছু নাই। তবু বৈকুণ্ঠপুরের বিখ্যাত নেতা আলালবাবু মোবাইলে একটি ফোটো পাঠাইয়া নিচে লিখিয়াছেন, বিধান রায় লহ প্রণাম। রায়বাবু অবশ্য প্রণাম লইতে পারেন নাই কারণ ফোটোখানি ছিল আম্বেদকর সাহেবের।

পুনর্পুনশ্চঃ কোচরাজ্যের প্রধান অমাত্য রজনীবাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গুজব এই যে তিনি নাকি কোচরাজ্যে বিমান নামাইবার প্রতিজ্ঞায় একখানি সেকেন্ড হ্যান্ড প্লেন কিনিবার জন্য গ্যারেজে গ্যারেজে ঘুরিতেছেন।

পু-পুনর্পুনশ্চঃ সমিতিতে মোমো আর চাউমিন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ 'টিকটক' উচ্চারণ করিলে গোঁসাই গোমূত্র ছিটাইয়া দিচ্ছেন। মূত্রের সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য একখানি গরু ভাড়া করিবার কথাও ভাবা হইতেছে।

বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারী

রাখি পুরকায়স্থ

২০১৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত। গোটা দেশ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল টেলিভিশনের পর্দায়, একটি ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকবে বলে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল চাঁদের বুকে চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর সফল অবতরণের। এই চন্দ্রাভিযানের সাথে জড়িয়ে ছিলেন এক ঝাঁক বিজ্ঞানী। তবে 'লিঙ্গ ভূমিকা' সম্পর্কিত প্রচলিত ভাবনাধারার বশবর্তী হয়ে আমাদের অবচেতন মনে ধারণা জন্মেছিল, এঁরা সকলেই পুরুষ। গণমাধ্যমগুলিতেও এই চন্দ্রাভিযানের 'মুখ' হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হচ্ছিল শুধুই ইসরোর চেয়ারম্যান কে.শিবনকে। প্রচারের আলোয় কি তেমনভাবে আনা হয়েছিল দুই মহিলা বিজ্ঞানী মুথাইয়া বনিতা ও রিতু কারিদহালকে? কতজন শিক্ষিত ভারতীয় জানেন তাঁদের নাম? অথচ, তাঁরাই তো ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানের দুই প্রধান কাণ্ডারি!

ইদানিংকালে মেয়েদের পরীক্ষার ফল ছেলেদের চাইতে অনেক ভালো। কিন্তু বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ কথা সত্যি, বিজ্ঞান পঠনপাঠনে ব্যাপৃত নারীদের সংখ্যা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেখা গিয়েছে, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা অনেকটাই কম।

ভারতে ২৮ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে। দিনটি বিশ্বখ্যাত নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমনের বিখ্যাত 'রমন-প্রভাব' আবিষ্কারের দিন। প্রতি বছরই জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের একটা থিম থাকে। চলতি বছরে (২০২০ সাল) জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম ছিল 'বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারী'। আশ্চর্যভাবে এই বিশেষ থিমটির মাধ্যমে এমন এক বিজ্ঞানীর সাফল্য উদযাপিত হল যিনি বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারীদের অনুপযুক্ত মনে করতেন! এটি ঐতিহাসিক সত্য!

পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৭% নারী। ইউনেস্কোর তথ্য বলছে, গোটা বিশ্বেই বিজ্ঞানে নারীদের উপস্থিতি মাত্র ২৮ শতাংশ। ভারতে সেটা আরও কম। ২০১৮ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, এ দেশে সেই হার কেবলমাত্র ১৪.৮ শতাংশ! আসলে বিজ্ঞানের দুনিয়ায় আজও নারীরা ব্রাত্য। আজও অস্বীকার করা হচ্ছে তাঁদের প্রকৃত যোগ্যতাকে। অথচ লিঙ্গভেদ রেখে বিজ্ঞানচর্চা অনৈতিক, অকার্যকরও বটে!

ভারতে ২৮ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে। দিনটি বিশ্বখ্যাত নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমনের বিখ্যাত 'রমন-প্রভাব' আবিষ্কারের দিন। প্রতি বছরই জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের একটা থিম থাকে। চলতি বছরে (২০২০ সাল) জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম ছিল 'বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারী'। আশ্চর্যভাবে এই বিশেষ থিমটির মাধ্যমে এমন এক বিজ্ঞানীর সাফল্য উদযাপিত হল যিনি বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারীদের অনুপযুক্ত মনে করতেন! এটি ঐতিহাসিক সত্য! সেই ইতিহাস লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানী কমলা ভাগবত সোহনির জীবন কাহিনিতে।

ভারত তখন ব্রিটিশদের হাতে পরাধীন। ব্যাঙ্গালোরের (বর্তমানে ব্যাঙ্গালুরু) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধিকর্তা ছিলেন সিভি রমন। পিএইচডি করবার জন্য সে-সময় আবেদন করেছিলেন কমলা। কিন্তু তাঁর সেই আবেদন খারিজ করেন রমন। কেন? কমলার দোষ, তিনি নারী! কমলা কিন্তু হাল ছাড়েননি। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নারীদের অনুপযুক্ত মনে করতেন যে সিভি রমন, তিনিই কিন্তু শেষমেশ কমলার সাফল্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড দেখে নিজের মত পাল্টাতে বাধ্য হন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের দ্বার চিরদিনের জন্যে অবারিত হয় নারীদের জন্য! বিজ্ঞানী রমন হয়ত মত বদলেছিলেন, কিন্তু মহিলা বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে তাঁর দেশবাসীগণের মানসিকতা কতটুকু বদলেছে?

দুর্ভাগ্যবশত, এক্ষেত্রে অধিকাংশ ভারতবাসীর জ্ঞান কল্পনা চাওলাকে দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। অথচ বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক ভারতীয় মহিলা রয়েছেন, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিজ্ঞানের আধুনিক রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। তাঁদের সে-সব যুগান্তকারী গবেষণা ও আবিষ্কার প্রভাবিত করেছে জনসাধারণের জীবনকেও। তাই সেই সকল বিজ্ঞান সাধিকাদের জীবন সংগ্রামের মর্ম উপলব্ধি করা এবং মূল্য স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অতীতের সেই সব প্রচার বিমুখ ভারতীয় বিজ্ঞান তপস্বিনীদের কর্মময় জীবন ও বিজ্ঞান সাধনার কাহিনি ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করা হবে, যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে, নিজ দক্ষতায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, পুরুষ আধিপত্যপূর্ণ বিজ্ঞানের দুনিয়ায় সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ নারীদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁদের জীবন কাহিনি নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে একবিংশ শতাব্দীর বহু বিজ্ঞান প্রিয় নারীকে।

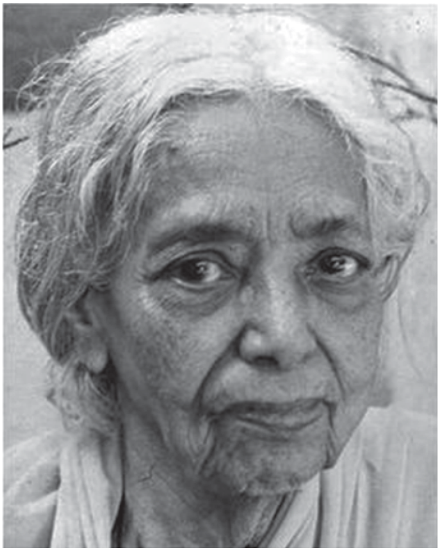

জানকী অম্মল

জানকী অম্মল: উদ্ভিদবিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধক

ডঃ এডভালথ কাক্কট জানকী অম্মল একজন কিংবদন্তি ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী, যিনি সাইটোজেনেটিক্স এবং ফাইটোজিওগ্রাফি নিয়ে অনন্য সাধারণ গবেষণা করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে উদীয়মান ভারতের উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী শক্তি ছিলেন তিনি। দীর্ঘ তিন দশক ব্যাপী বিস্তৃত কর্মজীবনে দেশের সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশবাসীর জন্যে তিনি রেখে গিয়েছেন এক বিস্ময়কর উত্তরাধিকার।

১৮৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তেল্লিচেরিতে (বর্তমানে কেরালা রাজ্যের থালাসেরি) একটি থিয়্যা সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জানকী অম্মল। থিয়্যাদের সমাজ মাতৃকুলভিত্তিক। সে-কারণে ওই সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েদের পড়াশোনা করতে কোনও বাধা ছিল না, বরং শিক্ষা গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা হত। তবে অধিকাংশ মেয়েরা যখন ললিতকলা চর্চায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, জানকী অম্মল তখন স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানকে! সেই সময়কার নারীদের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে এটি নিঃসন্দেহে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

তেল্লিচেরিতে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শেষ করে জানকী মাদ্রাজ চলে যান। সেখানে তিনি কুইন মেরি কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানেই অধ্যাপকদের উৎসাহে উদ্ভিদকোষের বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াতে তাঁর অপার কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, আর সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়েই জানকী উচ্চতর গবেষণা ও সেই সংক্রান্ত পড়াশোনায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

মাদ্রাজের উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর সুবিশাল কর্মজীবন শুরু হয়। এই সময় তিনি 'বারবার বৃত্তি' পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ভারতে ফিরে, আবারও উইমেনস খ্রিস্টান কলেজে পড়ানো চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে কিছুকাল পরেই প্রাচ্যের প্রথম 'বারবার ফেলো' হিসাবে তিনি পুনরায় মিশিগান পাড়ি দেন এবং ১৯৩১ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স বা পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে। জানকী অম্মল মার্কিন দেশ থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রাপ্ত প্রথম মহিলা এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডিএসসি প্রাপ্ত হাতে গোনা কয়েকজন এশিয়ান মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। মিশিগানে তাঁর জীবন সিঁড়ির এই দুটি ধাপ আসন্ন বছরগুলিতে তাঁর কর্মজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৩১ সালে ডঃ অম্মল লন্ডনের জন ইনস হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউশনে যোগ দেন। তবে এক বছর পরেই দেশে ফিরে আসেন। তারপর ত্রিবান্দ্রমের (বর্তমানে থিরুভানন্তপুরম) মহারাজা

১৯৩৯ সালে জেনেটিক্সের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে অংশ নিতে ডঃ অম্মল স্কটল্যান্ডের এডিনবরা যান, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মাঝে ভারতে ফেরা অসম্ভব হয়। এমতাবস্থায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনের জন ইনস হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউশনে সহকারী কোষবিদের পদে কাজ করেন। এখানেই তিনি 'ক্রোমোসোম এটলাস অফ কাল্টিভেটেড প্ল্যান্টস' শীর্ষক কোষবিদ্যা সংক্রান্ত অসামান্য বইটি প্রখ্যাত কোষবিদ সি.ডি. ডালিংটনের সহ-লেখক হিসেবে রচনা করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বইটির কারণেই আজও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কলেজ অব সায়েন্স-এ উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি। পরবর্তীতে যোগ দেন কোয়েম্বাটোরের সুগারকেন ব্রিডিং ইন্সটিটিউটে। ১৯৩৯ সাল অবধি সেখানেই কাজ করেন জিন বিশেষজ্ঞের পদে। সেখানে আখের সাথে অন্যান্য ঘাস প্রজাতির উদ্ভিদের, বিশেষত বাঁশের, সংকর সৃষ্টি করেছিলেন। সফলভাবে আখের একটি সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন, যা সে-সময়কার সাধারণ আখের চাইতে অনেক বেশি মিষ্টি।

১৯৩৯ সালে জেনেটিক্সের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে অংশ নিতে ডঃ অম্মল স্কটল্যান্ডের এডিনবরা যান, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মাঝে ভারতে ফেরা অসম্ভব হয়। এমতাবস্থায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনের জন ইনস হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউশনে সহকারী কোষবিদের পদে কাজ করেন। এখানেই তিনি 'ক্রোমোসোম এটলাস অফ কাল্টিভেটেড প্ল্যান্টস' শীর্ষক কোষবিদ্যা সংক্রান্ত অসামান্য বইটি প্রখ্যাত কোষবিদ সি.ডি. ডালিংটনের সহ-লেখক হিসেবে রচনা করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বইটির কারণেই আজও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তারপর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল অবধি তিনি ওয়াসলির রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে কোষবিদের পদে থেকে গবেষণা চালিয়ে যান। তিনিই ছিলেন এই সংস্থার প্রথম বৈতনিক মহিলা কর্মী। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই সৃষ্টি করেন তাঁর প্রথম সংকর ফুল— 'ম্যাগনোলিয়া কোবাস জানকী অম্মল'।

প্রায় এক দশক ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত বাগানের গাছ। এই সময় তিনি উদ্ভিদ কোষের ক্রোমোজোমের মানচিত্র প্রস্তুত করেন, যেখানে এই সমস্ত গাছেদের কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা আর তাদের জোড় বিন্যাসগুলি বর্ণনা করেছিলেন। এই সময়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, নানান পুষ্পল বৃক্ষ যেমন ম্যাগনোলিয়ার উপর কোলচিসাইন নামের রাসায়নিকের প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী ফুল ফলানো সম্ভব। এছাড়াও তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আলু, বেগুন ও টম্যাটো গাছের বিভিন্ন প্রজাতি, ধুতুরা, পুদিনা, লেবুগন্ধী ঘাস এবং খামালু।

১৯৫১ সাল। ডঃ অম্মল তখন ইংল্যান্ডে সফলভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সে-সময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পুনর্নবীকরণের জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরূপে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেই থেকে ডঃ অম্মল স্বদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় নানান পদে কর্মরত থেকে উদ্ভিদ

ও ভেষজ গবেষণায় নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি এলাহাবাদের সেন্ট্রাল বোটানিক্যাল ল্যাবরেটরির শীর্ষ পদ সামলেছেন। পরবর্তীতে জম্মুর রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে (বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন) বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে কাজ করেছিলেন। স্বল্পকাল ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রেও কর্মরত ছিলেন।

কর্মজীবনের অন্তিম লগ্নে এসে ডঃ অম্মল মাদ্রাজে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস ইন বোটানিতে ইমেরিটাস বৈজ্ঞানিক হিসাবে যোগ দেন। সেখানে ভেষজ গাছ এবং লোকজীবনে নানান গাছের ব্যবহার নিয়ে তাঁর গবেষণা অব্যাহত ছিল। এসময় তিনি কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালির জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল এই প্রকল্পটি সাইলেন্ট ভ্যালির পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ১৯৮৪ সালের ১৫ই নভেম্বর সাইলেন্ট ভ্যালিকে ‘জাতীয় উদ্যান’ ঘোষণা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত ডঃ অম্মল তা জেনে যেতে পারেন নি। মাদ্রাজের নিকটবর্তী মাদুরাভোয়ালে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফিল্ড ল্যাবরেটরিতেই ১৯৮৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দেহাবসান ঘটে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন! স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বিজ্ঞানের উত্থানকে এভাবেই সহায়তা করে গেছেন তিনি!

উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষকের দীর্ঘ জীবনে জানকী নানান সংস্থার সদস্য সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান একাডেমি অব সাইন্স এবং ১৯৫৭ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স একাডেমির সদস্য মনোনীত হন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক এলএলডি, ১৯৭৭ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী খেতাব, তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি মধ্যে কয়েকটি মাত্র। উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণার প্রসারে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও পরিবেশ মন্ত্রক ২০০০ সাল থেকে চালু করেছে শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা গবেষণার ক্ষেত্রে ‘ই. কে. জানকী অম্মল পুরস্কার’। জম্মু তাওয়াইয়ে ২৫ হাজারেরও বেশি প্রজাতির ভেষজ লতাগুল্মের একটি সংগ্রহশালা রয়েছে যা এই মহান উদ্ভিদবিজ্ঞানীর নামে নামকরণ করা হয়েছে— জানকী অম্মল হার্বেরিয়াম! উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর অবদানকে সম্মান জানাতে দুজন ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী, গিরিজা এবং বিরু বিরারাঘভন ২০১৮ সালে একটি নতুন গোলাপ সৃষ্টি করে, নামকরণ করেন ‘ই.কে. জানকী অম্মল’।

ডঃ অম্মলের সোজা-সরল জীবনযাপন দেখে অনেকেই তাঁকে ‘বুদ্ধিষ্ট লেডি মঙ্ক’ বলে অভিহিত করতেন। তবে তাঁর কীর্তিময় জীবন মোটেই বাধাবিঘ্নহীন ছিল না। সেই দীর্ঘ বন্ধুর কর্মজীবনের চড়াই-উৎরাইয়ে তিনি কেবলমাত্র বিজ্ঞান গবেষণাতেই লক্ষ্য স্থির রেখে বার বার নির্ভীক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তা সম্পাদন করার জন্য আশ্চর্যভাবে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজের চাপানো লিঙ্গবৈষম্যমূলক ও বর্ণবিদ্বেষজাত বিধিনিষেধ তাঁকে অভীষ্ট পথ-চলা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। যখনই তাঁর সাফল্যের দ্যুতিতে উজ্জ্বল জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হত তখনই তিনি বলতেন, ‘শেষ পর্যন্ত আমার কাজই কেবল বেঁচে থাকবে’, এবং ঠিক তাই-ই হয়েছে। সময়ের সাথে তাঁর কর্মকাণ্ডের গভীরতা এবং ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বিজ্ঞান বিশ্ব। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার আরও বহুগুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে, ক্রমশ তা লাভ করেছে অমরত্ব। জ্যোতির্ময়ী ডঃ জানকী অম্মল অক্লান্ত বিজ্ঞান সাধনায় মাঝেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের প্রকৃত অর্থ। একবিংশ শতাব্দীর নারীদের এভাবেই তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন একটি আলোকময় আশা-পথ।

হারিয়ে যাওয়া রান্না

ছক্কা

চাপড় ঘন্ট

ছক্কা

এই রান্নাটির নাম এমন কেন ছক্কা জানা নেই। ছক্কা প্রায়শই মিষ্টি কুমড়ো আর আলু দিয়ে করা হলেও আমার রান্নায় এটার সঙ্গে পটল দেয়া হয়। তিনরকম তরকারিই আলাদা করে ভেজে নিতে হবে। তারপর পাতলা টুকরো করে নারকোল কেটে নিতে হবে। সেটাও ভেজে রাখতে হবে। আর দেশি ছোলা,যেটা বেশ কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর সেদ্ধকরে রাখতে হবে প্রেশার কুকারে। এরপর সাদা জিরে, শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে সর্ষের তেল এ। আর হিং। তারপর সেদ্ধ ছোলা দিয়ে অল্প ভেজে তারপর টমেটো কুচি। একটু নরম হলে আদা বাটা,লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ আর ধনে গুঁড়ো। কষিয়ে নিয়ে জল। নুন, চিনি স্বাদমত। এরপর প্রথমে আলু তারপর পটল আর সবশেষে কুমড়ো। কেননা প্রতিটা সব্জির সেদ্ধ হবার নির্দিষ্ট সময় থাকে। আলু আর কুমড়ো একসাথে সেদ্ধ করলে ওটা ঘ্যাঁট হবে, ছক্কা নয়। এর ঝোল মাখামাখা হবে। ঘি, গরমমশলা আর ভাজা নারকোল দিয়ে নামাতে হবে। লুচির সাথে খুব ভালো লাগবে খেতে।

এঁচোড় ভুনা

এঁচোড় ভুনা

এটি খাঁটি বাঙাল রান্না। ডাইরেক্ট ফ্রম বাংলাদেশ। এঁচোড় খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিতে হবে। একটু সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। একটু বেশি তেল এ সাদাজিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর গোটা গরমমশলা ফোড়ন। তারপর পেঁয়াজ কুচি ভালো করে ভেজে বেশ কিছুটা রসুন থেঁতো করে দিয়েছি। তারপর একটু ভেজে নিয়ে টমেটোকুচি,আদাবাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদ,ধনে গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে তারপর এঁচোড়। আর নুন, চিনি। এবার এটাকে ঢেকে ঢেকে ধৈর্য ধরে ভাজতে আর কষাতে হবে। এটাই আসল আর কিছুই নয়। আমি জল দিই নি। কেউ চাইলে

দিতে পারো। ঘি, গরমমশলা দিয়ে নামিয়েছি। খেতে কিন্তু চিকেন ভর্তাকেও হার মানাবে, একবার করে দেখতে পারো। সময় এবং এঁচোড় কোনওটারই অভাব নেই।

চাপড় ঘন্ট

আমার দিদার হাতের চাপড় ঘন্ট দিয়ে সব ভাত খেয়ে নেওয়া যাবে। দিদার থেকে মা, আর মায়ের থেকে আমার শিখে নেওয়া। যে ভাবে পুরনো গয়না, বেনারসি বংশ পরম্পরায় হাতবদল হয়। সেভাবেই রান্নাও। এক একটি রান্না এক একটি সম্পদ বৈ কিছু নয়। তবে রান্না করি চাপড় ঘন্ট।

অনেক রকম সবজি লাগবে। যেমন পটল, ঝিঙে, মুলো, চালকুমড়ো, পেঁপে বা স্কোয়াশ, মিষ্টি আলু, বিনস বা বরবটি, বেগুন, কাঁঠালের দানা (যদি থাকে) সব কুচি করতে হবে। খুব ছোট করে কুচনো। বেগুন আর পটলটা আলাদা রাখতে হবে। মটর ডাল ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে মিহি করে বেটে নিতে হবে।

ডাল বাটা সামান্য লবণ দিয়ে চেপ্টা মতন করে বড়া ভেজে নিতে হবে লাল লাল করে। যেটাকে চাপড় বলা হয়। সর্ষের তেলে বেগুন ভেজে আলাদ করে রাখতে হবে। এবার পরিমাণ মত তেলে সামান্য মেথি ফোড়ন দিতে হবে। এবার মেথিগুলো ভাজা হয়ে গেলেই খুন্তির সাহায্যে সবটুকু মেথি তুলে ফেলে দিয়ে কালো সর্ষে আর তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে পটল ছাড়তে হবে; একটু ভেজেই বাকি সব সবজি। গোটা বাড়িতে সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে। এবার সব সবজি কিছুক্ষণ ভেজে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, আর চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। সবজি নরম হয়ে এলে পরিমাণ মত চিনি আর আদাবাটা দিতে হবে। আর ভেজে রাখা বেগুন। আর ডালের চাপড়গুলো ভেঙে দিয়ে দিতে হবে। একদম মাখামাখা হয়ে যাবে যখন তখন একবার চেখে দেখতে হবে নুন ঠিক হয়েছে কিনা। নামানোর আগে বড় এক চামচ ঘি আর গোটা ক'টা কাঁচা লঙ্কা গন্ধের জন্য। খাবার সময় বাবাকে দেখেছি এই তরকারি গরম ভাতে অল্প কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে মেখে খেতে।

চন্দ্রাশ্রী মিত্র (পাতা)

পুরাণের নারী

কর্ণপত্নী উরুভি

শাঁওলি দে

মহাভারতের কর্ণ চরিত্রটি ট্র্যাজিক। মহাভারতকারেরা যেন পণ করেই নিয়েছিলেন কিছুতেই জিততে দেবেন না কর্ণকে। তাই হয়ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন এক বিষাদগাথায় গেঁথে গিয়েছেন। মহাভারত জুড়ে কর্ণ বীর কিন্তু পরাজিত, গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উপেক্ষিত, দাতা কিন্তু নিঃস্ব এক চরিত্র। মহাভারত পড়তে পড়তে কোথায় যেন মনে হয় কর্ণকে উপেক্ষা করতে গিয়ে কর্ণের স্ত্রী সন্তানেরাও উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন।

মহাভারতের পরতে পরতে রয়েছে বর্ণভেদের নির্মম আখ্যান। আর কর্ণ ও তাঁর পরিবার আজীবন এই বর্ণভেদের শিকার। কর্ণ যে আসলে কুন্তি ও সূর্যদেবের পুত্র তা কুন্তী ছাড়া কেউই জানতেন না। সূতপুত্র রূপেই তাঁর পরিচয় ছিল। কর্ণের প্রথম স্ত্রী ভ্রুশালি ছিলেন সূত কন্যা। এই পর্যন্ত কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু কর্ণের জীবনে যে একমাত্র নারী তাঁকে সেই সমাজের চোখে জিতিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি এক ক্ষত্রিয় কন্যা উরুভি।

কর্ণ পছন্দ করতেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের আয়োজন করা হয়েছে শুনে তিনিও উপস্থিত হন পাঞ্চাল প্রদেশে। সেখানে শর্ত রাখা হয়েছিল যে এক জলপূর্ণ পাত্রের দিকে চোখ রেখে ওপরের দিকে না তাকিয়েই একটি ঝুলন্ত মাছকে তীরবিদ্ধ করতে হবে। সভায় উপস্থিত কেউই সেই শর্ত পূরণ করতে পারে নি। তখন কর্ণ এগিয়ে আসেন। কর্ণকে দেখে প্রতিবাদ করে ওঠেন দ্রৌপদী, কোনো সূত পুত্রের গলায় তিনি মালা দেবেন না। সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন এসে

শর্ত পূরণ করায় তাঁকেই স্বামীরূপে বরণ করেন পাঞ্চালকন্যা। অপমানিত হলেন কর্ণ। মাথা নিচু করে বের হয়ে যান কর্ণ সভা থেকে। এখানে বীরত্ব থেকে বড় ছিল জন্মগৌরব। কর্ণের জীবনের এই গল্পটি আমাদের কমবেশি পরিচিত।

ওপরের ঘটনাটি ছাড়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায়ভাবে কর্ণের রথের চাকা বসিয়ে দেওয়ার ঘটনাও কম যন্ত্রণার, কম অপমানের নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হেরে যাওয়া কর্ণকে একজনই মাত্র জিতিয়ে দিয়েছিলেন, 'পুরাণের নারী'র এই পর্বে রইল তাঁরই কাহিনী।

পুকেয় দেশের কাজকন্যার নাম ছিল ঊরুভি। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তানের সব আবদার মেনে নেন ওঁরা হাসিমুখে। ছোটবেলা থেকেই ঊরুভি শাস্ত্রচর্চা ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কুন্তী ও ঊরুভির মা ছিলেন পূর্বপরিচিতা ও বান্ধবী। কুন্তীর ইচ্ছে ছিল ঊরুভির সঙ্গে প্রিয় পুত্র অর্জুনের বিয়ে দেবেন। এই প্রস্তাবে কেউই অরাজি ছিলেন না। ঊরুভি ও তাঁর বাবা মা'ও খুশি। সেই সূত্র ধরেই কুন্তী একবার হস্তিনাপুরে ডেকে পাঠান ঊরুভিকে। তারপরই ঘটে এক 'অঘটন' যা অপমানের আগুনে জ্বলতে থাকা কর্ণকে শীতল স্পর্শ দিয়েছিল।

হস্তিনাপুরে সেইসময় আয়োজন করা হয়েছিল অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনের। কৌরব ও পাণ্ডবেরা তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার গুরুদেব দ্রোণাচার্যের কাছে শেখা বিদ্যার পরীক্ষা দেবেন সবার সামনে। ঘোষণা করা হবে শ্রেষ্ঠ শিষ্যর। যদিও স্থির করাই ছিল যে অর্জুনই হবে সেই শ্রেষ্ঠ শিষ্য, কারণ অর্জুনের থেকে বড় বীর আরও কেউ ছিল বলে জানা ছিল না কারোরই।

অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন হবে বলে কর্ণও সেখানে প্রবেশ করেন এবং প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন অর্জুনকে। কর্ণকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যান কুন্তী আর সূর্যাস্তের দোহাই দিয়ে প্রদর্শন বন্ধও করে দেওয়া হয়। এখানেও ভাগ্য সহায় হয় না কর্ণের। কর্ণ তাঁর বীরত্ব, কলাকৌশল দেখানোর সুযোগই পান না। আবারও অপমানিত হন তিনি। দুর্যোধন তখন এগিয়ে এসে কর্ণকে অঙ্গ রাজ্য দান করেন।

এসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন হস্তিনাপুর আসা ঊরুভির। তাঁর মন থেকে কখন যেন অর্জুন সরে গিয়ে কর্ণ জায়গা করে নেয়। যদিও তিনি জানতেন রাজ্য পেলেও কর্ণ ক্ষত্রিয় নন, সুতরাং তাঁদের বিয়ে হলে তা হবে সমাজে নিন্দনীয়।

এর কিছুদিন পর পুকেয় রাজ্যের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় ঊরুভির স্বয়ংবর সভার। সেই সভায় অর্জুন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ঊরুভি মালা পরান কর্ণকে। সঙ্গে সঙ্গে সভায় উপস্থিত সকলে নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বিধান দিলেন এই বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। একজন সূতপুত্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয় কন্যার বিয়ে অসম্ভব।

সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অতীতে ঘটে যাওয়া দেবযানী ও যযাতির বিয়ের উদাহরণ দিয়ে স্বীকৃতি দিলেন কর্ণ ঊরুভির এই প্রতিলোম বিবাহ। সেই সঙ্গে স্বীকৃতি পেলেন ঊরুভিও।

ঊরুভির কথা সম্পূর্ণ মহাভারতে আর সেভাবে পাওয়া যায় না। যদিও এটা জানা যায় যে ঊরুভি তাঁর পূর্বে শেখা বিদ্যা দ্বারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আহত সৈন্যদের সেবা করেছিলেন। কর্ণের জীবনের শেষ দিন অবধি ঊরুভি হয়ে ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে দেখা যায় কর্ণ ও ভ্রুশালির সন্তানেরা মারা যান পাণ্ডবদের হাতে, বেঁচে থাকে ঊরুভির সন্তান। এত কিছুর পরও তাঁর সন্তান যে বর্ণভেদের এই নিষ্ঠুর নিয়মের বেড়াজাল কি আদৌ কোনওদিন ভাঙতে পেরেছিলেন? আজও প্রশ্ন জাগে।

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.